নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ উপকরণ

জৈব কৃষি এবং উদ্যানবিদ্যা

(ডিপ্লোমা)

(Organic Agriculture and Horticulture)

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ১ ● কৃষিতে রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশকের উপর অত্যধিক নির্ভরতার কুফল

অধ্যায় সূচি

১.১ মাটির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসে ফসলের কম উৎপাদন

১.২ কৃষিতে বিভিন্ন রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা

১.৩ রাসায়নিক কীটনাশক ও সার ব্যবহারে খাদ্যপদার্থের বিষক্রিয়া

১.৪ পরিবেশ দূষণ-বাতাস, জল এবং মাটি দূষণ

১.৫ ফসলের কীটপোকার প্রাকৃতিক শত্রু হ্রাস

১.৬ জৈব বৈচিত্র্যের ওপর আঘাত

১.১ মাটির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসে ফসলের কম উৎপাদন

বিগত পঞ্চাশ বছরে কৃষিক্ষেত্রে যে হারে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বেড়েছে তার চেয়ে অধিক হারে কমেছে জৈব সারের ব্যবহার। শস্য নিবিড়তা বাড়ায় কমেছে গোচারণ ক্ষেত্র। যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ায় কমেছে গবাদি পশুর সংখ্যা। শস্যাবশেষ এবং গোবর ও গোমূত্রের ব্যবহারও কৃষকগণ ভুলে গেছেন। ফলে, দিনে দিনে মাটির জৈব পদার্থের ভাণ্ডারে টান পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই জমি হারাচ্ছে তার উর্বরাশক্তি, মাটি হারাচ্ছে তার স্বাস্থ্য। কৃষক আজ যথেষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করেও আশানুরূপ ফলন পাচ্ছে না।

দিনের পর দিন অনিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি রাসায়নিক প্রয়োগের ফলে মাটি হারাচ্ছে তার স্বাভাবিক গঠন, গ্রথন, জলধারণ ক্ষমতা, হিউমাস এবং উপকারী জীবাণু ভাণ্ডার। এভাবে চলতে থাকলে মাটি হয়ে যাবে অনুর্বর, বন্ধ্যা। উৎপন্ন ফসল হবে রাসায়নিক অবশেষযুক্ত, বিষাক্ত এবং পরিবেশ হবে কলুষিত।

চাষবাসে জমির মাটিই হল প্রধান উপকরণ, যার সুস্বাস্থ্য রক্ষা জরুরি। মাটির প্রধান উপাদান হল বালি, পলি, কাদা, জৈব পদার্থ, হিউমাস, উদ্ভিদখাদ্য, জল, বাতাস, বিভিন্ন উপকারী জীবাণু ইত্যাদি। এইগুলি সঠিক মাত্রায়, সঠিক অবস্থায় থেকে, উর্বরতার মান ঠিক রেখে, জমির ফসল উৎপাদিকা শক্তি সর্বাধিক বজায় থাকলে, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষিত বলে ধরা যায়। স্বাস্থ্যকর মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে জৈব পদার্থ এবং এর থেকে প্রস্তুত হিউমাস। জৈব পদার্থের সাথে থাকে অসংখ্য জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শ্যাওলা, প্রোটোজোয়া, কেঁচো। এরা নানাভাবে জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে এবং উদ্ভিদ খাদ্য জোগাতে সাহায্য করে। কিন্তু, মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি হলে উপকারী জীবাণুর পরিমাণ হ্রাস পায় এবং উর্বরতার হ্রাস ঘটে।

কীভাবে মাটির স্বাস্থ্যহানি হয় ঃ

- মাটিতে পরিমাণমত জৈব পদার্থের জোগানে ঘাটতি হলে।
- রাসায়নিক কীটনাশকের বিষক্রিয়ায়, জৈবপদার্থের অভাবে, মাটির অম্লত্বের হ্রাসবৃদ্ধিতে এবং উপকারী জীবাণু প্রভৃতি ধ্বংস হলে।
- ভূমিক্ষয়, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা, অতিরিক্ত অম্লতা ও ক্ষারত্ব প্রভৃতির ফলেও মাটির স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

১.২ কৃষিতে বিভিন্ন রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা

আধুনিক কৃষিতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ (সার, শস্যরক্ষার বিষাক্ত ঔষধাবলী, আগাছানাশক ইত্যাদি) বহুল ব্যবহারে মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়ছে। এদের বিষাক্ত অবশিষ্টাংশে মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ব্যবস্থা, লিভার (যকৃৎ) এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় দেহযন্ত্র ইত্যাদি বিকল হচ্ছে।

বিষাক্ত রোগ-পোকা-আগাছানাশক ফসলে যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে বাড়ছে অবসাদ বা উদ্যমহীনতা, নিদ্রাহীনতা, অন্ধত্ব, মারণরোগ ক্যানসার বা কর্কটরোগ এবং আন্ত্রিক সমস্যা। এইসব রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ মাটিতে মিশে ভূস্তরের জলে সংবাহিত হয় পানীয় জল এবং সেচের জল সাংঘাতিকভাবে দূষিত করছে। এর ফলে মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশনহানি ঘটছে, যেমন ঃ

(১) মস্তিষ্কের ক্ষতি ঃ সদ্যজাত শিশুরা অপুষ্টি, রুগ্নতা এবং স্বল্পমেধা সম্পন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করছে। তাদের স্নায়ুতন্ত্র বিকল হচ্ছে।

(২) জন্ম অপূর্ণতা ঃ শিশুদের জন্মকালীন নানা অপূর্ণতা যেমন, শ্বাসকষ্ট, রক্তচলাচল সমস্যা, বিকলাঙ্গতা প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে।

(৩) মৃত সন্তান প্রসব ঃ গর্ভবতী মহিলাদের ভ্রূণ মৃত্যু বা মৃত সন্তান প্রসব হচ্ছে। অনেক সময় নিশ্চল বাচ্চার জন্ম হচ্ছে।

(৪) গর্ভপাত সমস্যা ঃ গর্ভবতী মায়েদের অকালে গর্ভপাত সমস্যা বাড়ছে। অনেক সময় গর্ভবতী মায়েদের গর্ভধারণ সম্পূর্ণ হচ্ছে না।

(৫) ব্রেন টিউমার ঃ মানুষের মস্তিষ্কে আব বা ক্যানসার রোগ ধরা পড়ছে, বিশেষ করে যারা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে সরাসরি যুক্ত থাকেন।

(৬) জন্মগত বিকৃতি ঃ রক্ত প্রবাহজনিত অসুখ, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়, শ্বাসকষ্ট, অপুষ্ট হাত-পা, ওজন কম হওয়া ইত্যাদি নানা জন্মগত ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। গর্ভবতী মায়েরা, যারা চাষের কাজে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার এবং শস্যরক্ষার কাজে যুক্ত থাকেন, তাদেরই এসব বেশি দেখা যাচ্ছে। তারা কম ওজনের, লম্বায় খাটো অপুষ্ট বাচ্চার জন্ম দিচ্ছেন। মায়েদের বুকের দুধেও এইসব বিষাক্ত রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ দেখা দিচ্ছে, যার ফলে তাদের সদ্যজাত বাচ্চাদের জন্য মাতৃদুগ্ধও আর নিরাপদ থাকছে না।

তাই আধুনিক কৃষিতে শস্যরক্ষার বিষাক্ত ওষুধ ব্যবহার না করে জৈবিক উপায়ে বিভিন্ন শস্যরক্ষার ওষুধ এবং জৈবিক চাষ পদ্ধতি অবলম্বনই একমাত্র উপায়।

রোগপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেগুলি মূলত ছয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন ঃ

(১) পারদঘটিত (মারকিউরিক ক্লোরাইড, মিথোক্সিইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড-সেরেসান, অ্যাগালল, সেরেসান ড্রাই, এমিসান ইত্যাদি)

(২) অরগ্যানো ক্লোরিন (জৈব-ক্লোরিন) জাত (ডিডিটি., বিএইচসি, ডাইএলড্রিন, অলড্রিন, হেপ্টাক্লোর ইত্যাদি)

(৩) কার্বোমেট (কার্বোসালফান, কার্বারিল, অ্যাল্ডিকার্ব, মিথোমিল ইত্যাদি)

(৪) অরগ্যানো ফসফেট বা জৈব ফসফেট (অ্যাসিফেট, ক্লোরোপাইরিফস, ডায়াজিনন, ডাইমিথোয়েট, ডাইক্লোরভস, ম্যালাথিয়ন, ফেনিট্রোথিয়ন, ফোরেট ইত্যাদি)

(৫) সিন্থেটিক পাইরিথ্রয়েড (ডেল্টামেথ্রিন, ফেনভালেরেট ইত্যাদি)

(৬) নিওনিকোটিনয়েডস (অ্যাসিমাপ্রিড, ইমিডাক্লোপ্রিড, ক্লোথায়ানিডিন, থায়োমেথোক্সাম ইত্যাদি)।

পারদঘটিত ওষুধ এত বেশি বিষাক্ত যে তা কেবল মাত্র অঙ্গজ জননের মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়, এমন ফসলের বীজ শোধনের কাজে ব্যবহারের জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় ওষুধগুলি বমি বমি ভাব, উদরাময়, শরীরের ভিতরে রক্তক্ষরণ, বুকে ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ সৃষ্টি করে।

জৈব ক্লোরিন জাত কীটনাশকগুলি এবং এই জাতীয় কিছু আগাছানাশক (২-৪-ডি, ২-৪-৫-টি, ইত্যাদি) রসায়নগুলি সহজে বিয়োজিত হয় না বা খুব ধীরে ধীরে বিয়োজিত হয়। এজন্য এই রসায়নগুলি সাংঘাতিকভাবে পরিবেশকে দূষিত করে এবং খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশের পর উচ্চস্তরের খাদকদের শরীরে এদের বায়োম্যাগনিফিকেশন ঘটে। এই রসায়নগুলি ঢোকার পর প্রাণীদেহ থেকে বেরিয়ে যায় না এবং খাদকের শরীরে খাদ্যের মাধ্যমে যতটুকু প্রবেশ করে, সমস্তটাই তার শরীরে জমা থেকে যায়। ফলে, কোন একটি শ্রেণির খাদকের শরীরে তার খাদ্যের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় এই রসায়নগুলি জমা হয়। এই হল বায়োম্যাগনিফিকেশন। সেজন্য সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর খাদক যেমন মাছ ও মাংসভোজী প্রাণীদেহে এই সমস্ত রসায়নগুলি অত্যধিক মাত্রায় সঞ্চিত হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট জীবদেহের স্বাভাবিক জৈবরাসায়নিক ক্রিয়াকে ব্যহত করছে। অনেক মৎসভোজী প্রাণী বর্তমানে অবলুপ্ত প্রায় প্রাণীর তালিকায় স্থান পেয়েছে। এই রসায়নগুলি তাদের প্রজনন ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

এই রসায়নগুলি খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করায় সমগ্র বিশ্ব জুড়েই পুরুষ জাতির স্পার্ম কাউন্ট কমে যাচ্ছে এবং সমগ্র পুরুষ জাতি ধীরে ধীরে বন্ধ্যাত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কৃষিকাজে ডিডিটি ও অন্যান্য কিছু ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার বাতিল করা হলেও, সারা বিশ্ব জুড়ে এই ওষুধগুলির আগে যত ব্যবহৃত হয়েছে তার অবশেষ এখনও প্রকৃতিতে রয়ে গেছে এবং উন্নত দেশগুলিও এর কুফল থেকে মুক্ত নয়।

আগাছানাশক ওষুধগুলিও মানুষ ও অন্যান্য গবাদি পশুর জন্মগত বিকৃতি ঘটায়।

জৈব ফসফরাস (যেমন, মনোক্রটোফস, ডাইক্লোরভস, ফসফামিডন, ফলিডল, ডায়াজিনন, কুইনালফস, ফোরেট ও কার্বামেট (কার্বারিল, কার্বোফুরান) জাতীয় কীটনাশকগুলি সাংঘাতিক রকমের বিষাক্ত এবং খুব অল্পমাত্রায় এগুলি শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায়। এগুলি বমি ভাব, উদরাময়, ঘাম ও লালা নিঃসরণ ও পেশির কম্পন ইত্যাদি সৃষ্টি করে এবং কেন্দ্রীয় ও পার্শ্বীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে।

নিওনিকোটিনয়েডস জাতীয় কীটনাশকগুলি অতি অল্প মাত্রায় কাজ করে ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে এদের বিষক্রিয়া কম।

কোন কোন কীটনাশকে কিছু ভারী মৌল পদার্থ (যেমন সীসা, পারদ, তামা, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক, জিঙ্ক ইত্যাদি) থাকে। এই মৌল পদার্থগুলি শরীরে কোষের অভ্যন্তরে বিপাক ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায় এবং স্নায়বিক ও মানসিক রোগ সৃষ্টি করে। এগুলি ক্যান্সার, হাঁপানি, লিউকোমিয়া, শ্বেতী ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে। মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড, বৃক্ক, যকৃত ও ফুসফুসকে দুর্বল করে। এজন্য, পৃথিবীতে মানসিক ও শারীরিক ভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা বাড়ছে।

মানুষের দেহে কীটনাশক বায়ু বাহিত হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে, দুষিত খাদ্য খাওয়া ও দূষিত জল পানের মাধ্যমে এবং কীটনাশকের সরাসরি সংস্পর্শে আসলে চামড়ার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। মানবদেহে কোন কীটনাশক কতটা বিষক্রিয়া করবে, তা নির্ভর করে দেহের মধ্যে কতটা কীটনাশক প্রবেশ করেছে তার উপর ও সংশ্লিষ্ট কীটনাশকটি কতটা বিষাক্ত। জমিতে যারা কৃষিকাজ করেন ও তাদের পরিবারবর্গ সরাসরি কীটনাশকের সংস্পর্শে আসেন এবং কীটনাশকের প্রতি উন্মুক্ত হয়ে পড়েন। তবে, পৃথিবীর সমস্ত জনগণের দেহের চর্বিতে কিছু পরিমাণে কীটনাশক রয়েছে। শিশুরা বিশেষ করে কীটনাশকের প্রতি বেশি সংবেদনশীল কারণ তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। ছয় মাসের কম শিশুরা মায়ের দুধের মাধ্যমে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। কিছু কিছু কীটনাশক দীর্ঘদিন ধরে মানবদেহে জমতে থাকে। উত্তর আমেরিকায় বর্তমানে শিশুদের লিউকোমিয়া ও অন্যান্য ক্যান্সার বেড়ে গেছে। এর কারণ হিসাবে খাদ্যদ্রব্যে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক যা দেহকোষের জিনের মিউটেশন ও বিষক্রিয়া ঘটায়, তাদের উপস্থিতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.৩ রাসায়নিক কীটনাশক ও সার ব্যবহারে খাদ্যপদার্থে বিষক্রিয়া

দিনের পর দিন অধিক মাত্রায় বিষাক্ত রাসায়নিক কীটনাশক ও সার ব্যবহারে মানুষ এবং সমগ্র প্রাণীজাতির খাদ্যবস্তু বিষক্রিয়ায় অভোজ্য হয়ে উঠছে। এসব খাবার খেয়ে স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে সকলের।

ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন শ্রেণীর দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক ব্যবহার করে উৎপাদিত শস্য থেকে প্রস্তুত করা খাবার খেয়ে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর শরীরের চর্বিতে বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয় হচ্ছে ধীরে ধীরে। এমনকী দুধ, মাখন ও পনীরে এই শ্রেণীর কীটনাশকের থেকে যাওয়া অবশিষ্টাংশ সরাসরি বিষক্রিয়া তৈরী করছে প্রাণীদেহে।

পারদ ও তামার মতো ভারী ধাতু দিয়ে তৈরি করা ছত্রাকনাশকগুলি চাষের কাজে ব্যবহার করলে মাটিতে সঞ্চিত হয়ে থাকে। সহজে বিয়োজিত বা নিবদ্ধ হয় না। পরে ওই মাটিতে উৎপাদিত ফসল

খেলে মানুষ ও প্রাণীদেহে বিষক্রিয়া হয়। যেমন, পারদঘটিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা ধানের খড় খাওয়ানো গরুর দুধে পারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

গমচাষে ব্যবহৃত হেপ্টাক্লোর ও ম্যালাথিয়ন কীটনাশকের বিষক্রিয়া পাওয়া গেছে উৎপাদিত গমের আটা ও ময়দায়। টমাটো, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ঢ্যাঁড়শের নমুনা পরীক্ষা করেও এই বিষক্রিয়া পাওয়া গেছে। অলড্রিন, ডাইঅলড্রিন, এনড্রিন ও এন্ডোসালফানের মতো রাসায়নিক কীটনাশকের বিষক্রিয়াও পাওয়া গেছে সবজিতে। গোরু ও মোষের দুধ এবং মধুতেও পাওয়া গেছে হেপ্টাক্লোর-এর বিষক্রিয়া।

রাসায়নিক কীটনাশকের ক্ষতিকারক অবশিষ্টাংশ এখন খাদ্যে বিষক্রিয়া এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে তা আর উপেক্ষা করার মতো নয়। যে ফসলের চাষেই রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা হবে, বিষক্রিয়া অল্পবেশি থাকবেই তাতে।

এবার রাসায়নিক সারের প্রসঙ্গে আসা যাক। ইউরিয়া বা অন্য ধরনের রাসায়নিক নাইট্রোজেনঘটিত সার মাটিতে প্রয়োগের পর নাইট্রেট ও নাইট্রাস অক্সাইডে ভেঙে যায়। সারে উপস্থিত নাইট্রোজেন খাদ্যউপাদানটির ৩০ শতাংশ মাটিতে প্রয়োগের পর গাছ নিয়ে নেয়। বাকি ৭০ শতাংশ থেকে যায় মাটিতে। এর কিছু অংশে আবার পানীয় জলের সঙ্গে মেশে। শাকসবজি, ফলমূল ও পানীয় জলের সঙ্গে নাইট্রেট ঢোকে মানুষ ও অন্য প্রাণীর দেহে। নাইট্রাস অক্সাইড মেশে বাতাসে।

গবেষণা করে দেখা গেছে, শরীরে নাইট্রেট বেশি গেলে, রক্তে একাধিক মারাত্মক রোগ হয়। অক্সিজেনের জোগান কমে মানব শরীরে এবং দেখা দেয় নানা উপসর্গ। শিশুদের ব্লু বেরি সিনড্রোম থেকে মৃত্যুও হতে পারে। ক্যান্সার হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। অন্যদিকে, নাইট্রাস অক্সাইড বাতাসে মিশলে কার্বন ডাই অক্সাইডের চেয়ে ৩০০ শতাংশ বেশি উষ্ণায়ণ ঘটতে পারে।

নাইট্রেট ছাড়াও নাইট্রোজেন সার দিয়ে চাষ করলে, উৎপাদিত ফসল দিয়ে খাবারের মাধ্যমে মানব দেহে অ্যামাইন ও অ্যামাইড নামের দু'টি যৌগ প্রবেশ করে। নাইট্রেট ভেঙে তৈরি নাইট্রাইটের সঙ্গে এই দু'টি রাসায়নিক যৌগ মিশলে তৈরি হয় নাইট্রোস্যামাইন ও নাইট্রোস্যামাইড যৌগ, যা মানব দেহে ক্যান্সার রোগের জন্ম দিতে পারে।

সুপার ফসফেট ও ডিএপি-র মতো ফসফেট সারে আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সিসা এবং নিকেল জাতীয় ভারী ধাতু থাকে। পটাশ সার মিউরেট অব পটাশে থাকে ক্লোরিন। ফসলের চাষে এই সারগুলির অধিক ব্যবহার করলে, উৎপাদিত ফসলে ক্ষতিকর ধাতু ও ক্লোরিনের পরিমাণ বেশি থাকে, যা মানবদেহে নানারকম জটিলতা সৃষ্টি করে।

১.৪ পরিবেশ (বাতাস, জল ও মাটি) দূষণ

মাটি, উদ্ভিদজগৎ, পশুপাখি, মানুষ, বাতাস ও জল — সব মিলিয়ে আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ সুস্থ থাকলে আমরা সুস্থ থাকব। পরিবেশ দূষিত হলে, মানুষ কেন, অন্য কোন প্রাণীর স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে না। এমনকী, উদ্ভিদ জগৎ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে আমাদের দেশে ধান, গম প্রভৃতি ফসলের উচ্চফলনশীল জাতের চাষ শুরু হয়। এই জাতের ফসলের নিবিড় চাষে প্রয়োজন হয়ে পড়ে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার এবং

রাসায়নিক কীটনাশক ও আগাছানাশকের প্রয়োগ। বছরের পর বছর এইসব রসায়নের অধিক মাত্রায় প্রয়োগ দূষিত করেছে বাতাস, জল ও মাটি। ফলে নষ্ট হয়েছে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য।

মাটিতে নাইট্রোজেন সার ভেঙে তৈরি বিষাক্ত নাইট্রাস অকসাইড গ্যাস বাতাসে মিশছে। বিষাক্ত কীটনাশক ও আগাছানাশক স্প্রে করার সময় স্প্রের ক্ষুদ্র কণাগুলিও মিশছে বাতাসে। ফলে, দূষিত হচ্ছে বাতাস, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। ওই দূষিত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে রোগক্রান্ত হচ্ছি আমরা।

নাইট্রোজেন সার থেকে তৈরি নাইট্রেট মিশছে ভূগর্ভস্থ জলে। রাসায়নিক কীটনাশক ও আগাছানাশকের কিছু অংশ সরাসরি জলে মিশছে মাটির ওপরে। জলে মিশে আবার চুঁইয়ে গিয়ে মিশছে ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্গে। ফলে, বিষাক্ত হচ্ছে আমাদের পানীয় জল। মাটির ওপরে জমা জল বিষাক্ত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফসলের চাষে উপকারী অণুজীবি প্রাণী, কেঁচো ও সাপ, ব্যাঙের মতো আরো অনেক জীব, যেগুলি নিয়ে আমাদের পৃথিবীর জীব-বৈচিত্র্য যা সুস্থ পরিবেশের অন্যতম অঙ্গ। আর, ভূগর্ভের বিষাক্ত জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানুষ। চাষের জমিতে জমা জলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ মিশে গিয়ে পড়ছে পুকুরে ও নদীনালার জলে। দূষিত হচ্ছে এইসব জলাধারের জল। মরছে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী।

বাতাস ও জলের মতো দূষিত হচ্ছে মাটিও, যা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। মাটির দূষণের জন্য নাইট্রোজেন সার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন যৌগ এবং ফসফেট সারে উপস্থিত ভারী ধাতু ও পটাশ সারের ক্লোরিনের ভূমিকা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে। দূষিত কীটনাশক মেশা জল মাটির অভ্যন্তরে ঢুকেও ঘটাচ্ছে মাটির দূষণ।

মাটি, বাতাস ও জলের উপস্থিতিতে, অনেক রাসায়নিক পরিবর্তনের আধার হিসেবে কাজ করে এবং নষ্ট হয় অনেক দূষিত পদার্থের কার্যকারিতা। এর ফলে আমাদের পরিবেশ দূষণও কমে। কিন্তু, সেই মাটি যখন দূষিত হয়, পরিবেশের উন্নতি হবে কীভাবে! দূষিত মাটিতে কোন উপকারী অনুজীবি যেমন, ব্যাক্টেরিয়া, রাইজোবিয়াম, অ্যান্টিনোমাইসিটিস প্রভৃতি বাঁচতে পারে না। কেঁচো ও ঘুরঘুরে পোকাও মাটির অভ্যন্তরে বায়ু চলাচলে সাহায্য করার কাজে অসমর্থ হয়। মাটি একটি মিশ্র বস্তু। জল, বাতাস, জৈব পদার্থ, জীবাণু, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী — সব মিলিয়ে মাটির সৃষ্টি। এখন মাটি দূষিত হলে জল ও বাতাস দূষিত হবে। কমবে মাটির জৈব পদার্থ। সংখ্যায় কমবে মাটিতে উপস্থিত জীবাণু ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর সংখ্যা। সব মিলিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পরিবেশ।

১.৫ ফসলের রোগ-পোকার প্রাকৃতিক শত্রু হ্রাস

ফসলের যেমন অনিষ্টকারী পোকা আছে, তাদের খেয়ে ফেলার জন্য প্রাকৃতিক শত্রু পোকাও বর্তমান। অনিষ্টকারী পোকাগুলিকে শত্রুপোকা বলা হয় এবং অনিষ্টকারী পোকার প্রাকৃতিক শত্রুকে বন্ধুপোকা বলা হয়। কারণ, এরা শত্রুপোকাকে খেয়ে ফেলে আমাদের উপকার করছে। আমরা বন্ধুপোকাদের এতদিন চিনতাম না, কেননা, বন্ধুপোকা সাধারণত ফসলের ক্ষতি করেনা। বন্ধুপোকা দু'ধরনের হয়। পরভোজী পোকা ও পরজীবী পোকা। একটি পরভোজী পোকা সারা জীবদ্দশায় অনেক শত্রুপোকার ডিম, কীড়া ও পূর্ণাঙ্গ দশা খেয়ে ফেলে ধ্বংস করে। মাকড়সা, লম্বা শুঁড় ঘাসফড়িং হল পরভোজী বন্ধুপোকা। আবার পরজীবী বন্ধুপোকারা কোন একটি বিশেষ প্রজাতির শত্রুপোকাকে

আক্রমণ করে তার শরীরের ওপর বা ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বার হওয়া কীড়া ঐ আক্রান্ত শত্রুপোকা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। একটি পরজীবী বন্ধুপোকার সারা জীবদ্দশার জন্য সাধারণত একটি শত্রুপোকা লাগে। এ ছাড়া শত্রুপোকার মধ্যে রোগের সংক্রমণ ঘটিয়ে মেরে ফেলার জন্য মিটারহিজিয়াম, বিউভেরিয়া প্রভৃতি ছত্রাক, নিউক্লিয়ার পলি হেড্রোসিস, গ্রানুলোসিস প্রভৃতি ভাইরাস ও ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস ব্যাকটিরিয়া ফসলের শত্রুপোকার দেহে রোগ সৃষ্টি করে মেরে ফেলে। ফসলের ক্ষেতে শত্রুপোকার চেয়ে বন্ধুপোকার সংখ্যা অনেক বেশি। যেমন ধানখেতে ১০-১২ রকমের শত্রুপোকা আছে, কিন্তু বন্ধুপোকা আছে কম করে ২৫ রকমের। বন্ধুপোকারা শত্রুপোকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। কিন্তু যখন শত্রুপোকার সংখ্যা বন্ধুপোকার তুলনায় অনেক বেড়ে যায়, ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, অর্থাৎ ফলন কমে যায়। যে সংখ্যায় শত্রুপোকার উপস্থিতি ক্ষেতে ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতি করে, তাকে অর্থনৈতিক ক্ষতিকর সীমা বলা হয়। আবার ফসলের ক্ষেতে যে সর্বাধিক সংখ্যায় শত্রুপোকার উপস্থিতি ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতি করবে না অর্থাৎ ফলন কমাবে না, তাকে অর্থনৈতিক চরম সীমা বলা হয়। রাসায়নিক কীটনাশক আবিষ্কারের পূর্বে এই সকল বন্ধুপোকাই ফসলের অনিষ্টকারী পোকাকে দমন করে অর্থনৈতিক চরম সীমার মধ্যে রাখতে সাহায্য করত।

কিন্তু, ফসলে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার শুরু হতে ওই কীটনাশক শত্রুপোকার সাথে সাথে বন্ধুপোকাদের ধ্বংস করছে। ফলে, ফসলে বন্ধুপোকা কম থাকাতে শত্রুপোকার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে এবং ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। অর্থাৎ, কীটশত্রুর প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন ঘটছে। এর ফলে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি করতে কৃষকগণ বাধ্য হচ্ছেন এবং চাষের খরচ বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবেশ দূষণও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.৬ জৈব বৈচিত্র্যের ওপর আঘাত

জৈব বৈচিত্র্য বলতে, পৃথিবীর সমস্ত জীবকুলের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ও প্রকরণ রয়েছে তার ব্যাপ্তি ও তৎসহ যে পরিবেশে সেই সমস্ত জীবকুল বেঁচে রয়েছে তারও বৈচিত্র্যকে বোঝায়। একটি বিশেষ প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন জীবের বৈচিত্র্য, বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যেকার বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যে বৈচিত্র্য রয়েছে, তার সমষ্টিই হল সংশ্লিষ্ট এলাকার সামগ্রিক জৈব বৈচিত্র্য।

পৃথিবীতে ঠিক কত ধরনের জীব রয়েছে তা নির্ধারণ করা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পৃথিবীতে ৩০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি প্রজাতির জীব রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। তার মধ্যে ১৪.৩৫ লক্ষ প্রজাতিকে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। বহু প্রজাতির জীবকে এখনও পর্যন্ত সনাক্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যে সমস্ত প্রজাতি এখনও পর্যন্ত সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ৭৫১০০০ প্রজাতির পতঙ্গ, ২৫০০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ, ৬৮০০০ প্রজাতির ছত্রাক, ৩০০০০ প্রজাতির প্রটিস্ট (এক কোষী ও কলোনি তৈরি করে এমন বহু কোষী জীব), ২৬৯০০ শ্যাওলা, ৪৮০০ ব্যাকটেরিয়া এবং ১০০০ রকমের ভাইরাস।

জৈব বৈচিত্র্যের স্তর

পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার মূলে রয়েছে পৃথিবীর এই জৈব বৈচিত্র্য। এই জৈব বৈচিত্র্যের আবার তিনটি স্তর রয়েছে।

(১) জিনগত বৈচিত্র্য ঃ একটি প্রজাতির জীবের মধ্যে যে জিনগত তফাত রয়েছে তাই হল জিনগত বৈচিত্র্য। বিভিন্ন বাসস্থানে একই প্রজাতির বিভিন্ন জনসমষ্টির পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে এই বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়। এই বৈচিত্র্যের আবার তিনটি স্তর রয়েছে। জিনগত বৈচিত্র্যের জন্য বাস্তুতন্ত্রে ঘটে যাওয়া কোন পরিবর্তনের পর সংশ্লিষ্ট প্রজাতিটি ও বাস্তুতন্ত্র নতুন করে পুনরায় সবল ও সক্ষম হয়ে ওঠে। জিনগত বৈচিত্র্য থেকেই পরবর্তীকালে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

(২) প্রজাতি বৈচিত্র্য ঃ পৃথিবীতে যে বিভিন্ন রকমের কোষবিহীন ভাইরাস, এক কোষী ব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা, এক্টিনোমাইসিটিস ইত্যাদি এবং বহুকোষী জীব যেমন বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে, সেই বৈচিত্র্যই হল প্রজাতি বৈচিত্র্য। একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রের বা জীবগোষ্ঠীর স্বাভাবিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য এই প্রজাতি বৈচিত্র্য খুবই জরুরী। একটি বিশেষ জীব গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো বিশেষ প্রজাতির টিকে থাকা নির্ভর করে সেই জীব গোষ্ঠীর মধ্যে অন্য সমস্ত প্রজাতির প্রকৃতিতে টিকে থাকার উপর।

(৩) বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য ঃ বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য বলতে বোঝায় একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন জীব গোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈচিত্র্য, বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে যে বৈচিত্র্য এবং এই স্তরে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠী ও বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে উপস্থিত পারস্পরিক সম্পর্ক।

জৈব বৈচিত্র্য আমাদের কি উপকার করে ঃ

(১) পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখে।
(২) মানুষের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, কাঠ ও অন্য সামগ্রীর জোগান দেয়।
(৩) চিকিৎসার জন্য ওষুধ সরবরাহ করে।
(৪) পৃথিবীতে জল ও বায়ু বিশুদ্ধ করে।
(৫) উদ্ভিদের পরাগমিলনে সাহায্য করে।
(৬) ফসলকে রোগপোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
(৭) পৃথিবীকে সুন্দর দেখায়।
(৮) পরিবেশে বিভিন্ন দূষিত পদার্থের জৈব বিয়োজন ঘটিয়ে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করে।

জৈব বৈচিত্র্যের বিলোপ ঃ পৃথিবীতে প্রায় ৪০০ কোটি বছর পূর্বে জীবনের উদ্ভব হয়। জীবনের উদ্ভবের পর সুদীর্ঘ ৪০০ কোটি বছরের জৈব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে বর্তমান সকল জৈব বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যে হারে জৈব বৈচিত্র্য বিনাশ ঘটছে তাতে পৃথিবীতে মানুষ সহ বিভিন্ন জীবের টিকে থাকাই সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে।

সাধারণভাবে কিছু প্রজাতির বিনাশ ও নতুন প্রজাতির আবির্ভাব বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে সব সময় ঘটে চলে। সাধারণত প্রতি দশকে ১ থেকে ১০টি প্রজাতি বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে প্রতি বছর গড়ে ১০০-১০০০ গুণ বেশি মাত্রায় প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিগত ৫০ কোটি বছরে পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ বার জীবনের মহাবিনাশ ঘটেছে। এই সমস্ত মহাবিনাশ ঘটার সময়ে পৃথিবীর বহু প্রাণী যেমন ডাইনোসর পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রথম চারটি এই মহাবিনাশের কারণ ছিল, পৃথিবীর আবহাওয়াগত পরিবর্তন, বিশেষ করে তাপমাত্রার হ্রাস। পঞ্চম মহাবিনাশের কারণ ছিল পৃথিবীতে একটি বড় উল্কাপাত। কিন্তু, বর্তমানে যে ষষ্ঠ মহাবিনাশ ঘটে চলেছে তার মুখ্য কারণ, মানুষের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের ফলে পৃথিবীর পরিবেশ বিপর্যয়।

পৃথিবীর বর্তমান জৈব বৈচিত্র্য বিনাশের জন্য মুখ্যত ছয়টি কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

(১) পৃথিবীর জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়া এবং পৃথিবীর স্বাভাবিক সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার।

(২) কৃষিপণ্য ও বনজ পণ্যের ক্ষেত্রে অল্প কয়েকটি প্রজাতির ব্যবহার এবং কৃষিক্ষেত্রে, বনায়নে ও মাছ চাষে বহির্দেশীয় প্রজাতির ব্যবহার।

(৩) সমগ্র পৃথিবীতে পরিবেশ ও স্বাভাবিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে মূল্য দেয় না এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নীতির প্রবর্তন।

(৪) পৃথিবীতে স্বাভাবিক সম্পদের অসম বন্টন ও অসম ব্যবহার।

(৫) জৈব বৈচিত্র্য ও তার ব্যবহার বিষয়ে তথ্যের অপ্রতুলতা ও আরব্ধ জ্ঞানের ঠিকমত ব্যবহার না করা।

(৬) এমন আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যা পৃথিবীতে স্বাভাবিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার বাড়ায়।

(৭) কৃষিকাজে বহুল পরিমাণে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য রসায়নের ব্যবহার এবং দৈনন্দিন জীবনে ও শিল্প ক্ষেত্রে আরও বহু ধরনের কৃত্রিম রসায়নের ব্যবহার।

বিগত শতাব্দীর আগে পর্যন্ত পৃথিবীতে ভূমি-সম্পদ, জল-সম্পদ এবং অরণ্য সম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য ছিল। পরিবেশ ছিল নিস্কলুষ। মানুষের চাহিদা ছিল কম। সভ্যতা মূলত ছিল কৃষি নির্ভর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের পর গোটা বিশ্ব জুড়েই ক্রমে ব্যাপক শিল্পায়ন হতে থাকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ফলে পৃথিবীতে ক্রমাগত স্বাভাবিক সম্পদের বিনাশ ঘটতে থাকে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ দূষিত হতে থাকে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের পাশাপাশি কৃষিকাজেও প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাদ্য ও অন্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জোগান দিতে গিয়ে বর্তমানে চাষাবাদ ক্রমশ উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও সেচের জল এবং রাসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশক পর্যন্ত এগুলির ব্যবহার সীমিত থাকলেও, তার পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এগুলির ব্যাপক ব্যবহার ও অপব্যবহার হয়েছে ও হচ্ছে। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে সামগ্রিক কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও প্রাচীন টেকসই কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কৃষি ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেছে। অধিক সংখ্যক জনগণকে খাওয়ানোর জন্য অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে ভূমি, জল ও আনুষঙ্গিক পরিবেশের উপর অত্যধিক চাপ

পড়েছে এবং এদের উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হচ্ছে এবং তৎসহ পরিবেশে ভূমি, জল ও বায়ু দূষণ ঘটাচ্ছে। আঘাত আসছে জৈব বৈচিত্র্যে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পায়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক নগরায়নও হতে থাকে। ফলে, বিপুল জনগণের বসবাস ও খাদ্য সরবরাহের জন্য পৃথিবীর অরণ্যসম্পদ ব্যাপক ভাবে ধ্বংস করা হয়েছে ও হচ্ছে। পৃথিবীর অরণ্য সম্পদ ও ভূমি সম্পদ ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে। সুতরাং, ভবিষ্যতে অল্প জায়গায় বেশি খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু, এই রাসায়নিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা করতে গেলে, তার সুদূর প্রসারী ফল হবে খুব সঙ্গীন ও আত্মঘাতী। কেবল শিল্পায়নই নয়, চাষাবাদও ব্যাপকভাবে পরিবেশের দূষণ ঘটাচ্ছে। পৃথিবীর বেশ কিছু অঞ্চলে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও সেচের জল ব্যবহারের ফলে জমি উষর হয়ে গেছে, জলস্তর নেমে গেছে, ভূমিক্ষয় বাড়ছে, জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে যাচ্ছে, পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে এবং তৎসহ রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী মানুষ সহ সমস্ত জীবের স্বাস্থ্যের হানি ঘটাচ্ছে। এই বসুন্ধরা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সহ সমস্ত জীবকূলকে খাদ্য ও শক্তির জোগান দিয়ে এসেছে। কিন্তু, বর্তমানে আমরা এমন একটি সংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছি যে এই পৃথিবী ও তৎসহ সমস্ত জীবকুলের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। নষ্ট হতে চলেছে পৃথিবীর জৈব বৈচিত্র্য।

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ২ ● বিভিন্ন ধরনের কৃষি ব্যবস্থা (প্রতিটি ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা)

অধ্যায় সূচি

২.১ জৈব কৃষি - সংজ্ঞা, ভিত্তি এবং উপকার

২.২ সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা (জৈব ও অজৈব কৃষির সমণ্বয়)

২.৩ মিশ্র কৃষি

রাসায়নিক সার ও রোগপোকা দমন করার ওষুধ আবিষ্কারের আগে, পৃথিবীর সব দেশে জৈব সার ও জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে চাষ করতেন কৃষকরা। অর্থাৎ, সর্বত্র জৈব কৃষি ব্যবস্থা চালু ছিল।

গত শতাব্দীর উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে প্রথম রাসায়নিক সার সুপার ফসফেট তৈরি শুরু হয়। এরপর, ইউরোপ ও আমেরিকায় শুরু হয় নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের কাজ। ১৯১০ সালে আমেরিকায় প্রথম ট্রাক্টর নির্মাণ শুরু হয়েছিল। রাসায়নিক কীটনাশক হিসাবে ডিডিটি, বিএইচসি প্রভৃতি আবিষ্কার হয় ১৯৩৯ সালে।

সুতরাং, সময়ের হিসাবে প্রায় বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উন্নত দেশগুলিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি সহযোগে জৈব কৃষির বিকল্প তথাকথিত আধুনিক উন্নত কৃষি ব্যবস্থা চালু হয়। আমাদের দেশ ভারতে এই ব্যবস্থা আসে স্বাধীনতার পরে, যখন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কৃষি ব্যবস্থা উন্নয়েনের পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে হাত দেয়। শুরু হয় চাষবাসে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্রবর্ধমান ব্যবহার।

২.১ জৈব কৃষি – সংজ্ঞা, ভিত্তি এবং উপকার

রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক প্রভৃতি ব্যবহার বর্জন করে জৈব সার, জীবাণুঘটিত সার, জৈব কীটনাশক প্রভৃতির সাহায্যে বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন কৃষি পদ্ধতি সুসংহত করে এবং মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও তার উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি করে মানুষ ও প্রাণী সম্পদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপাদন এবং পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম চাষ ব্যবস্থাকে জৈব কৃষি বলা হয়।

এই কৃষি ব্যবস্থায় যে পদ্ধতিতে চাষবাস করা হয় তাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ থাকে না। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে রূপায়িত হয় এই কৃষি ব্যবস্থা।

জৈব কৃষি ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলে নীচে দেওয়া ধারণাগুলি ঃ

(১) বিভিন্ন ফসল চক্রে শুঁটি ফসলের অর্ন্তভুক্তি, ফসল চক্র মেনে বহুমুখী ফসলের চাষ এবং একাধিক ফসলের মিশ্রচাষ বা অর্ন্তচাষ করার ফলে জমির মাটির উর্বরতা শক্তি বজায় থাকবে। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা এবং রোগপোকার আক্রমণজনিত ক্ষতি কম হবে।

(২) রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার না হওয়ায় পরিবেশ দূষণ ও প্রাণীদেহে বিষক্রিয়া কম হবে। বজায় থাকবে মাটির উৎপাদিকা শক্তি ও উর্বরতা।

(৩) ফসল চাষের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ উপাদান কৃষকরা নিজের খামারে তৈরি করে নিতে পারলে ফসলের উৎপাদন খরচ কম পড়বে। চাষ থেকে লাভ বেশি হবে কৃষকদের।

(৪) উৎপাদিত ফসল বিষক্রিয়া মুক্ত এবং উচ্চ খাদ্য পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হওয়ায় বাজারে কৃষকরা বেশি দর পাবেন।

(৫) পরিবেশ দূষণ হবে না এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য সুনিশ্চিত থাকেবে।

(৬) ফসল চাষের সঙ্গে পশুপালন, মাছ চাষ, মৌমাছি পালন প্রভৃতির সমন্বয় থাকায় কৃষি ব্যবস্থা হবে সুস্থায়ী। কৃষিজীবি সব পরিবারের জীবিকা সুরক্ষিত থাকবে।

উপরে দেওয়া যে সব ধারণা জৈব কৃষি ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ, তার থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় এই কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কী কী লাভ ও উপকার হবে।

প্রথমেই উল্লেকযোগ্য যে, জৈব কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মাটি, উদ্ভিদজগৎ, পশুপাখি, মানুষ, এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী এবং সব মিলিয়ে আমাদের এই সবুজ গ্রহ পৃথিবীর পরিবেশের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি হবে। এই উন্নতি হবে ক্রমবর্ধমান এবং চিরায়ত।

জৈব কৃষি মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি করলে উৎপাদিত ফসল হবে স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর। এই ফসল থেকে তৈরি খাদ্য খেয়ে মানুষ ও পশুপাখির স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং উন্নত হবে। পরিবেশ স্বাস্থ্যের অনুকূল না হলে, জীবজগতের কোনও প্রাণীর স্বাস্থ্যই সুস্থ থাকে না।

জৈব কৃষি পরিবেশের পরিস্থিতি এবং স্থানীয় প্রাকৃতিক চক্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় বলে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশ আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অন্যদিকে, প্রকৃতির সব মৌলিক ব্যাপারগুলি বজায় থাকে। এই কৃষি ব্যবস্থায় ফসলের উৎপাদন নির্ভর করে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চাষের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার ও পুর্নব্যবহারের ওপর। ফলে প্রকৃতি যা দেয়, প্রকৃতিকে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। জৈব চক্র অপরিবর্তিত থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

জৈব কৃষি ব্যবস্থায় কৃষির সঙ্গে জড়িত সব কিছুই যথাযথ গুরুত্ব পায়। এ কারণে, জৈব কৃষির সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থা, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বিপণন ও বিতরণ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। সবাই মিলে এই পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এই জৈব কৃষি। উদ্ভিদ, মানুষ, অন্যান্য সব প্রাণী, এমনকী প্রতিটি জীবাণুর ভাল করাই জৈব কৃষির উদ্দেশ্য।

জৈব কৃষি ব্যবস্থায় রূপায়ণ একটি ধারাবাহিক কাজ। এতে কোনও বিরতির অবকাশ নেই। খুব সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এই কৃষি ব্যবস্থার রূপায়ণ হয় বলে কৃষক বা উৎপাদিত ফসলের ক্রেতা, কেউ একাকীত্ব বোধ করেন না। সমগ্র জৈব কৃষি ব্যবস্থায় একটি উঁচু স্তরের মূল্যবোধ থাকে। সবার ভালো করার প্রচেষ্টায় সামিল হওয়ার জন্য মানসিক আনন্দ হয়।

জৈব কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে, কৃষক প্রায় আত্মনির্ভর হয়ে চাষের কাজ করতে পারেন। রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি কেনার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করতে হয় না। ফলে, কৃষকের ঋণ করার প্রয়োজন খুব কমই হয়। ধরতে গেলে, সবকিছুই তার খামারে নিজের নিয়ন্ত্রণে ইচ্ছাধীন থাকে।

২.২ সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা (জৈব ও অজৈব কৃষির সমণ্বয়)

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার দু'টি দিক আছে। প্রথমটি হল, রাসায়নিক উপাদান নির্ভর চাষবাস। অন্যটি জৈব কৃষি। এই জৈব কৃষিতে এক শ্রেণীর কৃষক আধুনিক পদ্ধতিতে জৈব চাষ করেন। আর এক শ্রেণীর কৃষক, আর্থিক অক্ষমতার জন্য বাধ্য হয়ে জৈব চাষ করেন যাতে অনেক খামতি থেকে যায়। রাসায়নিক উপকরণ কিনে অজৈব চাষ করার সামর্থ্যও এদের নেই।

রাসায়নিক উপাদান নির্ভর কৃষি ব্যবস্থায় চাষবাসের পদ্ধতি এমন যে, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, আগাছানাশক, হরমোন প্রভৃতি নির্ধারিত পরিমাণে ব্যবহার করে অল্প জমিতে বেশি ফসল উৎপাদন করা যায়। এই চাষে জৈব সার কিছু পরিমাণে ব্যবহার হলেও, জৈব সার ও মাটির নিজস্ব উর্বরতা শক্তির বিকল্প হিসেবে নির্ভর করা হয় রাসায়নিক সারের ওপর। প্রাকৃতিক উপকরণের চেয়ে এই চাষে কৃত্রিম উপকরণ ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। মাটি, পরিবেশ ও প্রাণীজগতের কল্যাণ ও ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের কথা না ভেবে, এই চাষে শুধু গুরুত্ব পায় ফসলের অধিক উৎপাদন।

সম্পূর্ণ জৈব কৃষি ও বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থা, দু'টিরই ভালোমন্দ ও সুবিধা-অসুবিধা আছে। জৈব কৃষি সামগ্রীক বিচারে জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও পরিবেশের জন্য কল্যাণকর হলেও, প্রচলিত রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থা থেকে খুব দ্রুত সমগ্র কৃষি ব্যবস্থাকে জৈব কৃষিতে রূপান্তরিত করা হলে, শুরুতেই ঘাটতি হবে ফসলের উৎপাদনে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনের খাদ্য সরবরাহে সংকট তৈরি হবে। আর্থিক লাভ কম হবে কৃষকদের। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে, রাসায়নিক উপাদান নির্ভর কৃষি ব্যবস্থা থেকে জৈব কৃষি ব্যবস্থায় রূপান্তরের কাজ দ্রুত না করে, কয়েক বছর ধরে করতে হবে। এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হলে আমাদের দেশের পরিবেশ ও প্রাণীজগতের কল্যাণ হবে নিশ্চিত। তবু, দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে সংশয় থেকে যায়।

এই সংশয়ের কথা মাথায় রেখে এবং জৈব চাষের কল্যাণকর দিকগুলি বিবেচনা করে, সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশেও জৈব কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে প্রচলিত রাসায়নিক উপাদান নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার অপরিহার্য দিকগুলির সমণ্বয় করে, একটি সম্পূর্ণ সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যেমন, রাসায়নিক সারের প্রয়োগ পুরোপুরি বন্ধ না করে, এর প্রয়োগকে সুসংহত করে জৈব সার ও জীবাণু সার যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা। আবার, সুসংহত শস্যরক্ষা পদ্ধতির রূপায়ণ এবং জৈব কীটনাশক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থায় রাসায়নিক সার ব্যবহার

সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব না হলেও, রাসায়নিক কীটনাশক সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব। এছাড়াও, সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্য দিকগুলি যেমন, পশুপালন, মৌমাছি পালন, মৎস্যচাষ, বনায়ন প্রভৃতি প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থায় যুক্ত করা যেতে পারে। এটা করা হলে, কৃষকের হাতে থাকা সব সম্পদ ও উপাদানের যথার্থ ব্যবহার সুনিশ্চিত হবে। এর সঙ্গে, ফসল চক্র মেনে বহুমুখী ফসলের চাষ, ফসল চক্রে শুঁটি ফসলের অর্ন্তভুক্তি, মিশ্র ফসল চাষ প্রভৃতিও প্রচলিত রাসায়নিক উপাদান নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বিত করলে কৃষকরা উপকৃত হবেন। এর ফলে জমির উর্বরা শক্তি বজায় থাকবে। ফসলের ফলন কম না হয়ে বৃদ্ধি পাবে এবং অনেকটাই সুরক্ষিত হবে পরিবেশ।

২.৩ মিশ্র কৃষি

রসায়ন নির্ভর কৃষি থেকে জৈব কৃষিতে রূপান্তরের সময় দু'টি ব্যপারে খুব গুরুত্ব দিতে হয়। প্রথম গুরুত্বের বিষয়, প্রয়োজনীয় জৈব সার ও অন্যান্য জৈব পদার্থ সংগ্রহের কাজে স্বাবলম্বী হওয়া। চাষবাস থেকে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন এবং পরোক্ষভাবে চাষের কাজে সহায়তার জন্য ফসল চাাষের পাশাপাশি পশুপাখি ও মৌমাছিপালন এবং মৎস্যচাষ, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দু'টি কাজের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝা যায়, জৈব কৃষি ব্যবস্থায় মিশ্র কৃষি বা চাষের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। এক কথায়, জৈব কৃষিতে শস্য চাষ ও প্রাণী সম্পদের লালনপালন পরস্পরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি সম্ভব নয়।

মিশ্র কৃষি বা মিশ্র চাষের জন্য শুরুতেই দরকার মিশ্র খামার গড়ে তোলা। এই মিশ্র খামারে উন্নত চাষ পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনামাফিক ফসলের চাষ, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির প্রয়াস এবং পশু ও মৌমাছি পালনের সঙ্গে মৎস্যচাষ এক সঙ্গে হবে। মিশ্র খামারে গবাদি পশুর বর্জ্য পদার্থ গোবরের সাহায্যে কৃষক নিজেই প্রয়োজনের জৈব সার তৈরি করে নিতে পারবেন। এই গোবর সার ছাড়া, জমিতে গবাদি পশু চড়াবার সময় যে মলমূত্র সরাসরি পড়বে তা জমির উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। মিশ্র খামারে অন্তত চারটি গরু থাকলে একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট চালানো যায়। বায়োগ্যাসের স্লারির উর্বরতা শক্তি গোবর সারের প্রায় দ্বিগুণ। মিশ্র খামারে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসালে কৃষকরা জৈব সার তৈরির পাশাপাশি প্ল্যান্ট থেকে প্রাপ্ত গ্যাস দিয়ে ঘরে আলো জ্বালানো ও গ্যাস স্টোভে রান্নার কাজ করতে পারবেন। গরুর গোবর ও গোমূত্র গোবর সার, কম্পোষ্ট বা আবর্জনা পচা সার তৈরি ছাড়াও ভার্মিকম্পোষ্ট সার ও জৈব তরল সার তৈরির কাজে লাগে। এমনকী, পোকামাকড় দমনেও ব্যবহার করা চলে।

মিশ্র খামারে মুরগি পালন করলে ডিম ও মাংসের সঙ্গে উৎকৃষ্ট জৈব সার পাওয়া যাবে। এজন্য মুরগির ঘরে খড়বিচালি, গাছের পাতা, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি দিয়ে মেঝে তৈরি করে দিতে হয়। হাঁসের ঘরেও এরকম মেঝে করা যেতে পারে। মেঝের ওপর প্রতিদিন মুরগি বা হাঁসের বিষ্ঠা পড়ে ধীরে ধীরে মেঝে তৈরির উপকরণগুলি জীবাণুর ক্রিয়ায় জৈব সারে রূপান্তরিত হয়। গোবর সার বা আবর্জনা পচা সারের চেয়ে পোলট্রির সারে অধিক পরিমাণে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদান বর্তমান।

পুকুরে মাছ চাষ করলে হাঁস জলে ভেসে মাছের খাদ্য জোগায়। মৌমাছি পালন করলে মধু উৎপাদন করতে পারবেন কৃষকরা। পাশাপাশি, ফসলের খেতে মৌমাছি পরাগমিলনে সাহায্য করবে, যা গাছে ফল ধরার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

ফসল বিক্রী, দুধ-ডিম-মাংস বিক্রী এবং উৎপন্ন ফলমূল বিক্রী ছাড়াও জৈব কৃষি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিশ্র কৃষি থেকে কৃষকের অন্যভাবেও আয় বেশি হয়। এর প্রধান কারণ, ফসলের উৎপাদন খামারে তোলার পর উপজাত দ্রব্য যেমন খড়, ভূষি প্রভৃতি গবাদি পশুকে খাওয়াতে কৃষকের বাড়তি খরচ হয় না। পরিবারের সবাই এসব কাজে যুক্ত থাকতে পারে। মিশ্র খামারে কৃষকের সব ধরনের জমির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হয় এবং নিবিড় চাষের সুযোগ বাড়ে।

মিশ্র জৈবকৃষি ব্যবস্থায় প্রতিটি মিশ্র খামারে একটি করে ছোট জলবিভাজিকা বা 'মিনি ওয়াটারশেড' বা চওড়া বাঁধ দিয়ে তৈরি 'বাফার জোন' অথবা পুকুর থাকা খুব দরকার, যাতে বাড়তি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা যাবে। ছোট ডোবা বা প্লাষ্টিকে তৈরি জলাধারে অ্যাজোলা ও নীল-সবুজ শ্যাওলা চাষ করলে জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা অনেকটা মিটবে। জৈব চাষ পদ্ধতিতেও এটা প্রয়োজন।

এক নজরে মিশ্র কৃষি ব্যবস্থার মূল সুবিধাগুলি ঃ

(১) কৃষক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বাড়তি আর্থিক উপার্জনের সুযোগ।

(২) জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য শিম্বীজাতীয় ও অন্যান্য গোখাদ্য ফসলের চাষ বৃদ্ধি।

(৩) শস্যচাষে জমির ব্যবহার বাড়ে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(৪) চাষের উপজাত বস্তুগুলি খামারের গবাদিপশুকে খাওয়ালে, এর জন্য খরচ লাগে না।

(৫) উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ বর্জ্য পদার্থ দিয়ে জৈব সার তৈরি করা।

(৬) চাষের কাজ কম থাকলে পশুপাখি পালন প্রভৃতি করে কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ।

(৭) নিজের খামারের দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতির উৎপাদন কৃষকদের পরিবারের সদস্যকে জোগায় পুষ্টিকর খাবার।

(৮) জমির মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও তার সংরক্ষণ।

(৯) অসময়ের চাষের জন্য বাড়তি বৃষ্টির জল সংরক্ষণ।

ফসল-গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি ও মৌমাছি পালন – মৎস্যচাষ সমন্বিত মিশ্র কৃষির খামার ব্যবস্থাপনা

(Management of Integrated Farming System)

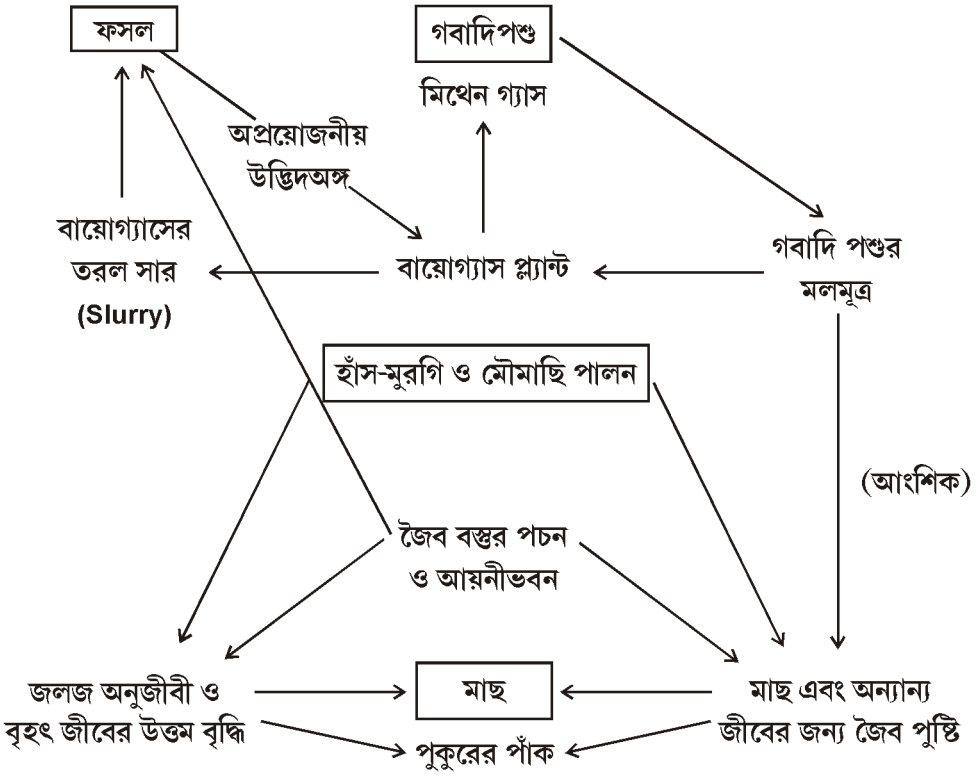

সার্বিক সুস্থায়ী উন্নয়নে মিশ্র কৃষির মাধ্যমে ফসল, গবাদিপশু, হাঁসমুরগি ও মৌমাছি পালন, মাছচাষ প্রভৃতি বিষয়গুলির সমন্বয়ে জৈব কৃষিব্যবস্থার সাহায্য নিলে পরিবেশবান্ধব চাষবাসের কাজ সহজ হবে। এই ব্যবস্থাপনায় যেমন গোবর সার থেকে ফসল চাষে পুষ্টি জোগান দেওয়া সম্ভব হবে, তেমনি রোগ-পোকা-আগাছার নিয়ন্ত্রণ বাড়বে। গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের ফলে রান্না এবং আলোর খরচে সাশ্রয় হবে। বায়োগ্যাসের তরল সার মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেবে ও মাছের জৈব পুষ্টি বাড়াবে। গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি পালনের মাধ্যমে জৈবসারের উৎপাদনও বাড়বে।

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ৩ ● জৈব কৃষির জন্য শস্য চাষ ব্যবস্থার বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন ধরন

অধ্যায় সূচি

৩.১ শস্যপর্যায় ও ফসলচক্র
৩.২ সাথী ফসল চাষ
৩.৩ মিশ্র ফসল চাষ
৩.৪ বহুফসলী চাষ
৩.৫ রিলে চাষ
৩.৬ অর্ন্তবর্তী ফসল চাষ

জৈব কৃষি ব্যবস্থায় কোনও জমিতে বছরে একটি মাত্র ফসল চাষ করলে চলবে না। আবার, এক জমিতে প্রতি বছর এক ধরনের ফসল চাষ করা সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ, জৈব কৃষির প্রাথমিক লক্ষ্য, যত বেশি পারো ও যেভাবে পারো, ফসল ফলানো নয়। জৈব কৃষির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি ব্যবস্থাকে সুস্থায়ী করা, মাটির উৎপাদিকা শক্তির ও উর্বরতার স্থায়ী বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ, উৎপাদিত ফসলকে বিষক্রিয়া মুক্ত করা। সারা বছর কৃষক পরিবারের সদস্য ও কৃষি মজুরদের কর্মসংস্থান। জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা। আর, এসবই করতে হবে কৃষকের হাতে থাকা চাষের উপকরণ ও রসদের যথাযোগ্য ব্যবহার এবং শস্য চাষ ব্যবস্থায় বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে, অন্যতম বিচার্য বিষয় থাকবে স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি।

৩.১ শস্যপর্যায় ও ফসলচক্র

জৈব কৃষিতে চাষের জমির মাটির গুণগত মান এবং উৎপাদিকা শক্তি বজায় রেখে তার ক্রমোন্নয়নের জন্য একই জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসলের পর্যায়ক্রমে চাষকে শস্যপর্যায় বলে। এই শস্যপর্যায়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের বা শ্রেণীর শস্যের নির্ধারিত নিয়মানুসারে পরপর চাষ। এককথায় পর্যায়ক্রমে শস্যের চাষ বা শস্যপর্যায় হচ্ছে, একই জমিতে প্রতি বছর এক ধরনের শস্যের চাষ না করে বিভিন্ন বছরে বা বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাষ। ইংরাজীতে একে বলে 'ক্রপ রোটেশন' (Crop Rotation)।

শস্যপর্যায় মেনে চাষ করলে চাষীরা বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হবেন। এর মধ্যে প্রথমে আসে, জমির মাটিতে অবস্থিত উদ্ভিদ খাদ্যের পর্যাপ্ত ও সার্বিক ব্যবহার। কারণ, বিভিন্ন শস্য তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে নেয়। দ্বিতীয়ত, শস্যপর্যায় আগাছা দমনেও সহায়ক হয়। সারা বছর ধরে জমিতে ফসল থাকলে, বারবার চাষ দিতে হয়। ফলে অধিকাংশ আগাছা অনুকূল পরিবেশের অভাবে মরে যায়।

এক এক ধরনের ফসলে এক এক রকমের রোগ ও পোকার আক্রমণ হয়। সুতরাং, একই জমিতে বিভিন্ন রকমের ফসলের চাষ করলে একই রোগপোকা বেঁচে থাকা ও বংশ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ

পায় না। ফলে, পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসল চাষ করলে রোগপোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার কাজ সহজ হয়।

শস্যপর্যায় মেনে চাষের অন্যতম সুফল হচ্ছে, মাটির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তির সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধি। শস্যপর্যায়ে শুঁটি জাতীয় ফসল ও সবুজ সারের ফসল রেখে চাষ করলে মাটিতে জৈব পদার্থ যুক্ত হয়ে পরিমাণে বাড়ে। বন্ধ হয় মাটির ক্ষয় ও মাটি থেকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উদ্ভিদখাদ্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া। এর সঙ্গে, পর্যায়ক্রমে শস্যচাষ করলে চাষী সারা বছর কোনও না কোনও ফসল বাজারে বিক্রী করে টাকা উপার্জন করতে পারেন। একটি ফসলের ফলন কম হলেও অন্য ফসলের ফলন দিয়ে আগের ফসলের লোকসান পুষিয়ে নিতে পারেন চাষি। সারা বছরই চাষি পরিবারের সদস্যরা চাষবাস সংক্রান্ত কাজে নিজেদের ব্যস্ত রাখতে পারেন।

পর্যায়ক্রমে শস্যচাষ করে সুফল পেতে হলে, কয়েকটি বিষয়ে জোর দেওয়া দরকার। একই ধরনের শস্যের পরপর চাষ করা চলবে না। উদ্ভিদের ঝাঁকড়া শিকড় ও লম্বা শিকড় আছে এমন শস্যের চাষ করতে হবে পর্যায়ক্রমে। যেসব ফসল থেকে বেশি লাভ পাওয়া যায়, সেগুলির চাষই শস্যপর্যায়ে করা উচিত। ডালজাতীয় ফসল শস্যপর্যায়ে রেখে চাষ করলে মাটিতে জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এসব ফসলের চাষ খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য চাষের সঙ্গে পর্যায়ে রেখে করতে হবে। পর্যায়ে এমন একটি বা দু'টি ফসল রাখা দরকার যাতে প্রচুর পরিমাণে গাছের প্রধান খাদ্যউপাদানগুলি সারের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হয়। এই প্রয়োগ করা খাদ্যউপাদানের মাটিতে থেকে যাওয়া অবশিষ্টাংশ পরবর্তী ফসল মাটি থেকে গ্রহণ করতে পারবে। একই ধরনের চাষ পদ্ধতির ফসল এক পর্যায়ে একাধিক রাখা ঠিক নয়। পাশাপাশি, একই রকমের রোগপোকার আক্রমণ হয় এরকম ফসলের পর্যায়ক্রমে চাষ অনুচিত। সারা বছরের শস্যপর্যায়ের চাষের পরিকল্পনা করার সময় যে কোন একটি ঋতুতে জমি পতিত রাখার ব্যবস্থাও করতে হবে।

আদর্শ শস্যপর্যায়ের পরিকল্পনা

সময়	বেলেমাটি		দোআঁশ মাটি		এটেল মাটি	
	সেচপ্রাপ্ত	সেচবিহীন	সেচপ্রাপ্ত	সেচবিহীন	সেচপ্রাপ্ত	সেচবিহীন
প্রথম বছর	আউশ-আলু	আউশ-সরষে	পাট-ফুলকপি	পাট-গম	আমন-খেসারি	আমন-খেসারি
দ্বিতীয় বছর	পাট-সরষে	শণ-তরমুজ	পাট-সরষে	আউশ-সরষে	পাট-ছোলা	পাট-ছোলা
তৃতীয় বছর	ভুট্টা-চীনাবাদাম	বর্ষাতিমূলা-কলাই	ভুট্টা-মূলা	ভুট্টা-মূলা	আখ	আমন-পতিত
চতুর্থ বছর	ধান-ফুলকপি	পতিত	আখ	বরবটি-মিষ্টি আলু	ভুট্টা-পেঁয়াজ	পতিত

তিনটি ফসলের শস্যপর্যায়

সময়	সেচপ্রাপ্ত জমি	সেচবিহীন জমি
প্রথম বছর	পাট-ধান-গম/ভুট্টা, আলু	পাট-ধান-গম/সরষে/মুসুর
দ্বিতীয় বছর	ধইঞ্চা-ধান-গম	পাট-কলাই-তিসি/তিল
তৃতীয় বছর	ধান-আলু-তিল/সয়াবিন	ভুট্টা-ধান/কলাই-সরষে

শস্যপর্যায় মেনে চাষকে সম্পূর্ণ লাভজনক করে তুলতে হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার, চাষের এলাকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি, মাটি, জলবায়ু, উৎপন্ন ফসলের বাজার, চাষের খরচ, মূলধনের ব্যবস্থা, জলসেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা প্রভৃতি।

বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসলের বিজ্ঞানসম্মত চাষ জৈব কৃষির সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। ফসলচক্র এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফসলচক্রেও একই জমিতে সারা বছর একাধিক ফসল চাষের পরিকল্পনা থাকে। তবে, শস্যের ধরণ প্রতিবছর মোটামুটি একই রাখা হয়। এখানেই শস্য পর্যায়ের সঙ্গে তফাত। পাল্টালেও, তা চার-পাঁচ বছর অন্তর। ফসলচক্রে বছরে অন্তত একবার কোনও একটি শিম্বীগোত্রের চাষ রাখা হয় কারণ, এই ধরনের ফসল বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে মাটির উর্বরতা বাড়ায়। এক্ষেত্রেও, ফসল নির্বাচনে ফসলগুলির শিকড়ের গঠনের ওপর গুরত্ব দেওয়া হয় যাতে মাটির সব স্তরের খাদ্যউপাদান ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ফসলের চাষে। ফসলচক্রে ফসল নির্বাচনের সময় সেচের জলের ব্যবহারও মাথায় রাখা হয়। যেমন, বেশি জল লাগে এমন ফসলের পর চাষ করা হয় সেই ফসল যাতে কম জল লাগে। ফসলচক্রে বিভিন্ন ফসল থাকায়, রোগপোকার আক্রমণ দমন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

৩.২ সাথী ফসল চাষ

সাথী ফসল চাষ বলতে বোঝায়, একই জমিতে এক সঙ্গে একাধিক ফসলের এক সঙ্গে চাষ। এই চাষে সাধারণত, জমিতে একটি মূলফসলের গাছের সারির মধ্যে বা ফাঁকে ফাঁকে আর একটি বা দু'টি ফসলের চাষ করা হয়। এর ফলে, চাষী একই জমিতে একই সময়ে একই খরচে দু'টি বা তার বেশি ফসল ফলাতে পারেন। একারণে, এই পদ্ধতিতে ফসলের চাষকে অর্ন্তবর্তী ফসল চাষ বলা হয়। ইংরেজীতে এই পদ্ধতির নাম 'ইন্টারক্রপিং'।

এ ধরনের ফসল চাষে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যে, একটি ফসলের চাষ যেন অন্য ফসলের চাষকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। সাথী ফসল চাষে সুবিধা হল, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা বা অন্য কোনও কারণে, একটি ফসলের উৎপাদন মার খেলেও অন্য ফসলের উৎপাদন দিয়ে চাষী পরিস্থিতি খানিকটা সামলে নিতে পারবেন। এই পদ্ধতিতে ফসল চাষ করতে হলে, ফসল নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে একাধিক ফসলের গাছ যেন জল, আলো, খাদ্য, বাতাস নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে। এক ফসলের জন্য অন্য ফসলের গাছের বেঁচে থাকা ও সঠিক বৃদ্ধিতে ঘাটতি না দেখা দেয়। এই ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় উভয় প্রকার ফসল খুব ঘন করে লাগালে।

সাথী ফসল বা অর্ন্তবর্তী ফসল চাষের পরিকল্পনা করার সময় ফসল নির্বাচন, ফসলের জাতের বাছাই, কীভাবে চারা বা বীজ বসানো হবে এবং এলাকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে বিবেচনা করতে হবে। জৈব কৃষির সুফল পেতে হলে, দেখা গেছে, তন্তুল জাতীয় শস্যের সঙ্গে ডাল শস্য ও তেল শস্য একসঙ্গে চাষ করলে চাষের জমির মাটির সার্বিক উর্বরতা বৃদ্ধি পায়, চাষীর আর্থিক লাভ হয় এবং চাষী পরিবারের খাদ্যে পুষ্টিগুণ বাড়ে। সব ফসলেরই জাত নির্বাচনের সময় গাছের উচ্চতা, ফসল

পাকার সময়, গাছের পাতা কীভাবে ছড়ায় এবং বৃদ্ধির হার কীরকম খতিয়ে দেখতে হবে। এই পদ্ধতির ফসল চাষে সারি দিয়ে চারা বা বীজ লাগানো খুব কার্যকরী। মূল ফসলের সারির ফাঁকে আর একটি বা দুটি স্বল্পস্থায়ী অতিরিক্ত ফসল সহজেই পৃথক সারিতে চাষ করা যায়। নিবিড় শস্য চাষে সাথী ফসল চাষ খুবই প্রয়োজন।

সাথী ফসল চাষে শস্য নির্বাচন

মূল ফসল	সাথী ফসল
আলু	সরষে, মূলা, বীট, ফুলকপি, বাঁধাকপি
আখ	বেগুন, মূলা, লঙ্কা, পেঁয়াজ, গম
ভুট্টা (দানা শস্য)	অড়হর, বরবটি, সয়াবিন, কলাই
তুলা	লঙ্কা, চীনাবাদাম, সয়াবিন

সাথী ফসল চাষে প্রধান সুবিধা হল ঃ

(১) যে কোনও পরিস্থিতিতে ফসল ফলনের কমবেশি নিশ্চয়তা থাকে।

(২) জমির মাটির উৎপাদিকা শক্তির যথাযথ ব্যবহার হয়।

(৩) আগাছা ও রোগপোকার উপদ্রব কম হয়।

(৪) মূল ফসল ও সাথী ফসল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একে অন্যকে সাহায্য করে, বিশেষ করে একটি ফসল শুঁটি জাতীয় হলে।

(৫) মাটির ওপর ফসলের গাছের পাতার আচ্ছাদন বেশি হয় বলে, ভূমিক্ষয় কমে যায়।

(৬) একটি জমি থেকে সব ফসল মিলে মোট উৎপাদন অনেক বেশি হয়, তুলনায় কম খরচে।

সাথী ফসল চাষে প্রধান অসুবিধা হল, জমিতে চাষের সময় কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা থাকে। অনেক সময় মূল ফসল সাথী ফসলের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে। কোনও ফসলেরই চূড়ান্ত উৎপাদন পাওয়া যায় না। কিন্তু, দুই ফসল মিলিয়ে মোট উৎপাদন ও চাষীর মোট আয় বেশি হয়। এছাড়া, বৃষ্টিনির্ভর বা খরাপ্রবণ এলাকায় সাথী ফসলের চাষ চাষীর কাছে সবসময় লাভজনক হয়ে ওঠে।

৩.৩ মিশ্র ফসল চাষ

এক জমিতে একাধিক ফসলের বীজ বুনে বা চারা লাগিয়ে মিশিয়ে চাষ করাকে মিশ্র চাষ বলে। প্রধানত, অসেচ ও খরাপ্রবণ এলাকায় দুই বা তার বেশি স্বল্পকাল স্থায়ী ফসলের চাষ এই পদ্ধতিতে করা হয়। অনেক সেচ এলাকাতেও এই পদ্ধতিতে চাষীরা চাষ করেন। এই পদ্ধতির চাষে ফসলের গাছ বড় হওয়ার পর জমির মাটি গাছের পাতায় ঢেকে যায়। ফলে, মাটি সহজে শুকিয়ে যায় না। মিশ্র ফসল চাষে দু'টি ফসলের বীজ পরপর সারিতে আলাদা করে অথবা, মিশিয়ে ছড়িয়ে বুনে লাগানো যায়। উদাহরণ ঃ গম ও সরষে, সরষে ও মূলা, আলু ও সরষে, আলু ও ফুলকপি। উদাহরণ ঃ গম ও সরষে, সরষে ও মূলা, আলু ও সরষে, আলু ও ফুলকপি।

মিশ্র ফসল চাষেও কিছু নিয়ম সাথী ফসলের মতো মেনে চলতে হবে। যেমন, লাগানো একাধিক ফসলের গাছের মধ্যে জল, আলো, বাতাস, মাটি থেকে খাদ্য আহরণ প্রভৃতি নিয়ে ক্ষতিকর

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া অবাঞ্ছনীয়। জমিতে পাতলা ঘনত্বে শস্যগুলির চাষ করতে হবে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে যেন একটি ফসল অন্তত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে। আবহাওয়া প্রতিকূল হলেও যেন একটি ফসলের উৎপাদন ভালো হয়।

জৈব কৃষি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মিশ্র ফসল চাষও জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এছাড়া, চাষের খরচ কম হয় ও একই খরচে এবং পরিচর্যায় একাধিক ফসল এক সঙ্গে এক জমি থেকে পাওয়া যায়। মিশ্র চাষ বেশি হয় ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনকারী ফসলের ক্ষেত্রে।

৩.৪ বহুফসলী চাষ

সারা বছর ধরে বিভিন্ন চাষের মরশুমে একই জমিতে বহুরকমের ফসলের চাষকে বহুফসলী চাষ বলে। অনেক ফসলের উন্নত স্বল্পস্থায়ী জলদি শংকর জাতের উদ্ভাবন এই বহুফসলী চাষকে সহজ করে তুলেছে। সাধারণত, খরা এলাকায় এই চাষ বিশেষ কার্যকরী। এই চাষে ফসল নির্বাচনের সময় ডালশস্য বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর সঙ্গে চীনাবাদাম, সয়াবিন ও কুসুম এবং স্বল্পস্থায়ী অন্যান্য খরা সহনশীল ফসল চাষ চাষীর জমির সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। উদাহরণ ঃ পাট-আউশ ধান-আলু/গম/শীতকালীন সবজি (সেচ এলাকায় হালকা মাটির জন্য); তিল - আমন ধান-ছোলা (সেচবিহীন এলাকার জন্য); আমন ধান-বোরো ধান (সেচ এলাকায় ভারী মাটির জন্য)

৩.৫ রিলে চাষ

রিলে চাষও এক ধরনের বহুফসলী চাষ। এক্ষেত্রে, একটি ফসল পাকার আগে একই জমিতে আর একটি ফসলের বীজ বোনা হয় এবং এই দু'টি ফসল পাকার মধ্যে আর একটি স্বল্পস্থায়ী ফসল চাষ সম্পূর্ণ করে নেওয়া হয়। আবার, এই তৃতীয় ফসল কাটার আগেই বুনে দেওয়া হয় চতুর্থ ফসলের বীজ। এভাবে, মুগ, ভুট্টা ও গমের সঙ্গে একই জমিতে এক বছরে সরষে চাষ সম্ভব। ফসল ও ফসলের জাত নির্বাচন এবং চাষ পদ্ধতি সঠিক হলে রিলে চাষ ক্ষুদ্র চাষীর জমিতেও ফসলের উৎপাদন অনেক বাড়াতে পারে। রিলে চাষ অন্য অর্থে এক নিবিড় ফসল চাষের প্রক্রিয়া। এতে সারা বছর জমি আগাছা মুক্ত থাকে। ফসলের নির্বাচনে একটি শিম্বীগোত্রীয় ফসল রাখা অত্যন্ত জরুরি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে। উদাহরণ ঃ মুগ (বৈশাখী) → ভুট্টা (গঙ্গা-৩) → সরষে (টোরি) → গম (সোনালিকা)।

৩.৬ অর্ন্তবর্তী ফসল চাষ

অর্ন্তবর্তী বা মধ্যবর্তী ফসল চাষে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রধান ফসলের সঙ্গে দু'একটি স্বল্পকালীন ফসল চাষ করা হয়। এই স্বল্পকালীন ফসল চাষের জন্য আলাদাভাবে জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, পরিচর্যা, সেচ প্রভৃতি আলাদা বাড়তি খরচ লাগে না। প্রধান ফসল চাষের খরচেই এগুলির চাষ হয়ে যায় এবং চাষী বিনা খরচে অতিরিক্ত ফসল ঘরে তুলে আয় করেন। যেমন, আলু ক্ষেতে সরষে বা শীতকালীন সবজি অর্ন্তবর্তী ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। আম কাঁঠালের বাগানে গাছ যখন ছোট থাকে, তখন দু'টি গাছের সারির মাঝখানে খরিফ বা রবি মরশুমের শাকসবজি চাষ করা যেতে পারে। অর্ন্তবর্তী ফসল চাষের জন্য এমন ফসল নির্বাচন করতে হবে যেগুলি প্রধান ফসলের সঙ্গে আলো, বাতাস, জল, মটি থেকে খাদ্য উপাদান গ্রহণ প্রভৃতির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। উদাহরণ ঃ আখের জমিতে লঙ্কা, মূলা, পালং, মুগ, পেঁয়াজ চাষ। আম, কাঁঠালের বাগানে কলা বা সবজি চাষ।

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ৪ ● জৈব কৃষি (প্রকরণ)

অধ্যায় সূচি

৪.১ কৃষি ব্যবস্থার ধারণা

৪.২ জৈব খামার গড়া

৪.৩ জৈব খামার গড়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ও পদ্ধতি

আদিম যুগে মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রাহক। গাছ থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে খেয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি করত। ধরিত্রীর মাটি কর্ষণ করে ফসল ফলানো তার জানা ছিল না। চাষবাস করে নিজের জন্য এবং গৃহপালিত পশুপাখির জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে মানুষ শিখেছে মাত্র দশ হাজার বছর আগে।

৪.১ কৃষি ব্যবস্থার ধারণা

কোন জমিতে কোন ফসলের চাষ হবে; সেই ফসলের কোন জাত হবে সঠিক নির্বাচন; চাষে কি সেচ দেওয়া হবে, না হবে না; রাসায়নিক উপকরণের ব্যবহার হবে, না জৈব উপকরণ; চাষের কাজে কী ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার হবে — এই সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে একটি কৃষি ব্যবস্থা।

মানুষ যখন প্রথম চাষবাস শুরু করল, জঙ্গল পুড়িয়ে গাছের ছাই অথবা, ফাঁকা খালি জমিতে ফসলের বীজ ছিটিয়ে বুনে দিত। সার, সেচ, কীট ও আগাছানাশক প্রয়োগের প্রশ্নই ছিল না। এসব তখন কোথায়! এ ধরনের চাষকে বলা হয়, 'ঝুম' চাষ ব্যবস্থা। যেহেতু, ঝুম চাষে কোন রাসায়নিক উপকরণ প্রয়োগ হত না, এই চাষ ব্যবস্থা এক অর্থে জৈব চাষ ব্যবস্থার আদি রূপ।

এরপর সভ্যতার সমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চাষের কাজে, বিশেষ করে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে, প্রাকৃতিক জৈব পদার্থ ব্যবহার শুরু করল। আজকের জৈব কৃষি ব্যবস্থার জন্ম এভাবেই। রামায়ণ মহাকাব্যে, মাটিতে মৃত পচা বস্তু ও আবর্জনা মিশিয়ে মাটিকে উর্বর করে চাষবাস করার উল্লেখ আছে। ঋকবেদ থেকে জানা যায়, সে আমলে জৈব সার ব্যবহারের কথা। অথর্ববেদে উল্লেখ আছে, সবুজ সার ব্যবহারের। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ শতাব্দীতে লেখা আছে, জৈব সার হিসেবে বিভিন্ন তেলের খোল ও প্রাণীর বিষ্ঠা মাটিতে প্রয়োগ করে চাষবাসের পদ্ধতি। পবিত্র কোরান-এ, ফসলের ফলনোত্তর অবশিষ্টাংশ জমিতে ব্যবহার করে জৈব চাষবাসের কথা বলা হয়েছে।

পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা ক্রমশ বেড়েছে। ফসলের উৎপাদন বাড়াতে, শুধু বাড়তি জৈব পদার্থের মাটিতে প্রয়োগ এই চাহিদা মেটানোর পক্ষে এক সময় অপ্রতুল হয়ে ওঠে। ফলে, জৈব কৃষি ব্যবস্থা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় রাসায়নিক বা অজৈব কৃষি ব্যবস্থায়।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে রাসায়নিক সার হিসেবে প্রথম সুপারফসফেট তৈরি হয়। এরপর অ্যামোনিয়া সংশ্লেষ পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ার পরে ইউরোপ ও আমেরিকায় শুরু

হয় নাইট্রোজেনঘটিত সারের উৎপাদন। ডিডিটি, বিএইচসি প্রভৃতি কীটনাশক আবিষ্কার হয় ১৯৩৯ সালে।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিয়ে বিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থা সহযোগে ফসলের উৎপাদন শুরু করে। এই কৃষি ব্যবস্থায় প্রয়োজনভিত্তিক জলসেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতির বযবহারও জরুরি হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে রাসায়নিক কৃষি পদ্ধতিতে উচ্চফসলনশীল শস্যের নিবিড় চাষ খুব গুরুত্ব পায় গত শতাব্দীর ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে।

জৈব কৃষির পরিবর্তে রাসায়নিক কৃষি পদ্ধতির দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার ইতিমধ্যে কৃষিক্ষেত্রে অনেক কুফল তৈরি করেছে। অধিক উৎপাদনের জন্য জমিতে একাধিক ফসলের রাসায়নিক কৃষি পদ্ধতিতে চাষ এবং জৈব সারের অপ্রতুল ব্যবহার, রাসায়নিক সারের ওপর আজ অধিক নির্ভরশীলতা তৈরি করেছে। কিন্তু রাসায়নিক সার জমির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে না। অন্যদিকে, এই সারের ক্রমাগত বাড়তি প্রয়োগে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। জমির মাটির স্বাস্থ্যহরণের পাশাপাশি রাসায়নিক কৃষি পদ্ধতি দূষিত করেছে আমাদের পরিবেশ এবং মানুষ ও গৃহপালিত পশুপাখির মধ্যে ছড়িয়েছে নানা ধরনের মারণ রোগব্যাধি। এমনকী, দূষিত হয়ে গেছে ভূগর্ভের জল। নষ্ট হয়েছে, খাদ্যের পুষ্টি ও স্বাদ। সব মিলিয়ে, কৃষিক্ষেত্রে এক সমূহ ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে সারা পৃথিবীর সব দেশ।

এই ক্ষতির হাত থেকে নিস্কৃতির একমাত্র উপায়, জৈব কৃষি ব্যবস্থার দ্রুত পুর্নপ্রচলন। এই জৈব কৃষি ব্যবস্থা হবে আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব। এই জৈব কৃষি ব্যবস্থায় রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আগাছানাশক ব্যবহার বর্জিত হবে। অন্যদিকে, জৈব সার ও জৈব কীটনাশক, জীবাণুঘটিত সার প্রভৃতির সাহায্যে বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন চাষের পদ্ধতি সুসংহত করে মাটির স্বাস্থ্য ও উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশ বাড়িয়ে তুলে মানুষ ও প্রাণী জগতের জন্য নিরাপদ স্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।

বর্তমানে এই আধুনিক পরিবেশ বান্ধব জৈব কৃষি ব্যবস্থার রূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছে সারা বিশ্ব।

৪.২ জৈব খামার গড়া

জৈব কৃষি ব্যবস্থা রূপায়ণের জন্য দরকার জৈব খামার গড়া। এই খামার গড়ার জন্য প্রচলিত কৃষি পদ্ধতিতে অভ্যস্ত চাষীদের ধৈর্য ধরে অনেক পরিশ্রম করে প্রথমে জৈব চাষের প্রযুক্তি ও পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। এই কাজটা সহজ নয় এবং প্রচলিত কৃষি খামারকে জৈব কৃষি খামারে রূপান্তর সময়সাপেক্ষ। এতে কোনও বিরতির অবকাশ নেই। এই খামার গড়ার সময় চাষীদের খেয়াল রাখতে হবে যে, চাষের কাজে আমরা পরমুখাপেক্ষী হব না। সবকিছু আমাদের নিয়ন্ত্রণে এবং ইচ্ছাধীন থাকবে। চাষের কাজে সব প্রাকৃতিক উপাদান প্রথম ব্যবহার করার পর সেগুলির পুর্নব্যবহার হবে। জৈব কৃষির জন্য খামার এমনভাবে গড়তে হবে যাতে স্থানীয় পরিবেশ ও জৈবচক্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

জৈব খামার গড়ার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার ঃ

(১) খামারে শুধু ফসল চাষ নয়, একই সঙ্গে পশুপাখি পালন, মৌমাছি পালন, মৎস্যচাষ ও ফলফুল উৎপাদনেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(২) খামারের এলাকা এমন হবে, যেখানে বর্তমানে চাষবাসে রাসায়নিক উপকরণ কম ব্যবহার হয়।

(৩) খামারের সংলগ্ন এলাকা থেকে ফসল চাষের জন্য জৈব উপকরণ সরবরাহের সুযোগ থাকবে।

(৪) খামারটি যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকবে শহর ও বাজার এলাকার।

(৫) খামারে এলাকার বর্তমান শস্যবৈচিত্র্য বজায় রেখে চাষ হবে বিভিন্ন ফসলের।

(৬) রপ্তানিযোগ্য হবে জৈব কৃষিপদ্ধতিতে উৎপন্ন ফসল।

(৭) খামারের সংলগ্ন এলাকায় চাষের কাজের স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কৃষক সমবায়িকা, কৃষক সংগঠন, সহযোগী বেসরকারী সংস্থা প্রভৃতির উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

জৈব খামারে কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। জৈব চাষে ফসলের সর্বোচ্চ উৎপাদনের লক্ষ্য থাকে না। অন্যদিকে, চেষ্টা করা হয়, খামারে সংগৃহীত জৈব উপকরণগুলির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে যতটা সম্ভব বেশি ফসল ফলানোর এবং কৃষি ব্যবস্থাকে সুসংহত করে তোলার।

৪.৩ জৈব খামার গড়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ও পদ্ধতি

জৈব খামার গড়ার জন্য প্রথমেই জমির মাটিকে উদ্ভিদ খাদ্যে সমৃদ্ধ করে জমির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তিকে বাড়াতে হবে। এজন্য দরকার, জমির চরিত্র যাচাই ও মাটি পরীক্ষা। এরপর, বিভিন্ন ফসলের চাষে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ ক্রমশ কমিয়ে জৈব সার ও জীবাণু সারের ব্যবহার যতটা সম্ভব দ্রুত বাড়িয়ে উন্নত করতে হবে মাটির স্বাস্থ্য, উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি। একই সঙ্গে বৃদ্ধি ঘটাতে হবে মাটিতে বসবাসকারী ফসলের উপকারী জীবাণু ও অনুজীবের সংখ্যা। একাজে সময় লাগবে ৩-৪ বছর। জৈব ও জীবাণু সারের পাশাপাশি, রোগপোকার আক্রমণ দমনে ব্যবহার করতে হবে জৈব ও জীবাণুঘটিত কীটনাশক। আগাছা দমনের জন্য জৈব আগাছানাশক। এছাড়া, জোর দিতে হবে সুসংহত উপায়ে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণে।

জৈব খামারে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। এজন্য খামারের মধ্যে একটি পুকুর তৈরি করা যেতে পারে। এই পুকুরে মৎস্যচাষও হবে। প্রতিটি জৈব খামারে একটি নিজস্ব জল বিভাজিকা বা মিনি ওয়াটার শেড থাকতেই হবে। এটা সম্ভব না হলে, জমির ঢালের নীচে বাঁধ দিয়ে 'বাফার জোন' তৈরি করেও জল ধরে রাখা যায়। পুকুর পাড়ে, জলবিভাজিকা ও বাফারজোনের চারধারে নিম, পেয়ারা, ডালিম, পেঁপে, আতা প্রভৃতি ফলগাছ এবং গ্লাইরিসিডিয়া, জয়ন্তী, সুবাবুল, ঢোলকলমি (বেড়ায়) ও

কিছু ওষধি গাছ লাগালে জৈব চাষে কাজে লাগবে। ছোট ডোবা বা প্লাস্টিকে তৈরি জলাধারে অ্যাজোলা ও নীল সবুজ শ্যাওলা চাষ করলে জৈব সারের প্রয়োজনীয়তা খানিকটা মেটাবে।

জৈব চাষের জন্য জৈব সার তৈরি করতে হবে চাষীর জৈব খামারে। এজন্য খামারে কয়েকটি কম্পোষ্ট পিট, ভারমি কম্পোষ্ট পিট ও ড্রামে তরল সার তৈরির ব্যবস্থা রাখা দরকার। মাটিতে ফসলের উপকারী বিভিন্ন জীবাণু ও অনুজীবির বংশ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ভারমিওয়াশ, সঞ্জীবক, পঞ্চগব্য, জীবাম্রুত প্রভৃতি তরল সার প্রয়োগ জরুরি। তরল সার প্রয়োগ দ্রুত মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। তরল সারের মতো, চাষীরা নিজের জৈব খামারে বীজশোধন ও শস্যরক্ষার জন্য বিজাম্রুত, দশপর্নী, আগ্নেয়াস্ত্র, নিমাস্ত্র ও ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি জৈব কীটনাশকও তৈরি করে নিতে পারবেন।

খামারে জৈব কীটনাশক তৈরি করা ছাড়াও সুসংহত উপায়ে শস্যরক্ষার জন্য ফসল চাষের তালিকায় এক ফসল বারবার চাষ না করা, বন্ধুপোকার সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য প্রভৃতি গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে। এর পাশাপাশি আগাছা দমনের জন্য জৈব আগাছানাশক ব্যবহারের সঙ্গে সঠিক শস্যপর্যায় নির্বাচন, জমিতে আচ্ছাদন তৈরি, হাতনিড়াণির ব্যবহার ও চাষ দিয়ে আগাছা নির্মূল করার কাজগুলি করতে হবে সঠিক সময়ে।

জৈব খামারের খামার বাড়ির একটা অংশে গড়ে তুলতে হবে পশুপালন ও মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা। গবাদি পশুর গোয়ালের পাশেই থাকবে গোবর সার তৈরি করার জায়গা। খামারে গবাদি পশু বেশি থাকলে সেই জায়গায় গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট বসানো যেতে পারে। প্ল্যান্টে উৎপন্ন গ্যাস আলো জ্বালানো ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই দু'টি কাজের জন্য এবং সেচের পাম্প চালাতে জৈব খামারে সৌরশক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে নিলে আর্থিক দিক দিয়ে খুবই উপকৃত হবেন চাষীরা।

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ৫ ● উদ্ভিদের খাদ্য উপাদান

অধ্যায় সূচি

৫.১ খাদ্য উপাদানের নাম ও প্রয়োজন অনুসারে ভাগ

৫.২ গাছের দেহগঠন ও বৃদ্ধিতে বিভিন্ন খাদ্যউপাদানের ভূমিকা

যে কোনও প্রাণীর মতো বেঁচে থাকতে গাছেরও খাদ্য প্রয়োজন। গাছ খাবার পায় বাতাস, জল ও মাটি থেকে। বৃদ্ধি ও দেহগঠনের জন্য গাছের মোট ষোলটি খাদ্যউপাদান দরকার।

৫.১ খাদ্য উপাদানের নাম ও প্রয়োজন অনুসারে ভাগ

গাছের প্রয়োজনীয় ষোলটি খাদ্যউপাদানের নাম হল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, বোরণ, মলিবডেনাম ও ক্লোরিণ।

প্রয়োজনের বিচারে এই ষোলটি খাদ্যউপাদানকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি যথাক্রমে মুখ্য খাদ্যউপাদান, গৌণ খাদ্যউপাদান ও অণুখাদ্য উপাদান।

মুখ্য খাদ্যউপাদানের ভাগে আসে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম। গৌণ খাদ্যউপাদান হচ্ছে সালফার, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম। আর, অণুখাদ্য উপাদানের তালিকায় আছে আয়রণ, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, বোরণ, মলিবডেনাম ও ক্লোরিণ।

মুখ্য ও গৌণ খাদ্যউপাদানগুলিকে এক সঙ্গে গাছের প্রধান খাদ্যউপাদান হিসাবে ধরা হয়। এই খাদ্যউপাদানগুলি গাছের প্রয়োজন হয় বেশি পরিমাণে এবং এদের মধ্যে গাছ সবচেয়ে বেশি নেয় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম। অণু খাদ্যউপাদানগুলিও গাছের দেহগঠনের জন্য খুব জরুরি। কিন্তু, গাছ মাটি থেকে নেয় খুব কম পরিমাণে। ষোলটি খাদ্যউপাদানের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গাছ বাতাস ও জল থেকে নেয়। বাদবাকি তেরোটি নেয় মাটি থেকে।

৫.২ গাছের দেহ গঠন ও বৃদ্ধিতে বিভিন্ন খাদ্যউপাদানের ভূমিকা

গাছের পুষ্টি, দেহ গঠন ও বৃদ্ধির জন্য ষোলটি খাদ্যউপাদানের প্রতিটিরই এক সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। এ কারণে, কোনও খাদ্যউপাদান গাছ কম বা প্রয়োজনের বেশি নিলে গাছের বৃদ্ধির ক্ষতি হয়।

গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য কোন খাদ্যউপাদান কী কাজ করে তা নীচে দেওয়া হল।

কার্বন ঃ কার্বন উদ্ভিদ দেহ গঠনের প্রধান উপাদান। গাছের দেহে জল, বায়ু এবং সূর্যের আলোর সাহায্যে এই কার্বন শর্করা তৈরিতে সাহায্য করে। যে পদ্ধতিতে এই শর্করা প্রস্তুত হয় তার

নাম সালোকসংশ্লেষ। কার্বন ঘটিত যৌগ কার্বোহাইড্রেট ও শর্করা গাছের দেহে কোষ প্রাচীর তৈরি করে।

হাইড্রোজেন ঃ গাছের দেহে কার্বোহাইড্রেট ও অন্যান্য জৈব পদার্থ তৈরিতে সাহায্য করে।

অক্সিজেন ঃ গাছের সালোকসংশ্লেষ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজন হয়। গাছকে শক্তি জোগায়।

নাইট্রোজেন ঃ প্রোটিন এবং গাছের পাতা ও কান্ডের সবুজ অংশ তৈরি ও কোষ বৃদ্ধির জন্য এই খাদ্যউপাদানটি খুব দরকার। নাইট্রোজেন ছাড়া গাছের দেহ গঠন ও বৃদ্ধি অসম্ভব। এছাড়া অন্যান্য খাদ্যউপাদানের কার্যকারিতা নাইট্রোজেনের ওপর নির্ভর করে। গাছের দেহকোষের জন্য প্রোটিনের একটি উপাদান প্রোটোপ্লাজম তৈরিতেও সাহায্য করে। নাইট্রোজেনের অভাব হলে গাছের কান্ড ও শিকড়ের বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তলার দিকের পাতা ঝরে যায়। গাছে ফুল ও ফল কম হয়, ফসল তাড়াতাড়ি পাকে। ফসলের ফলনও কমে।

গাছ নাইট্রোজেন মাটি থেকে বেশি পরিমাণে নিলে, ফসল পাকতে দেরি হয়। গাছের রোগপোকার আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। দানাজাতীয় ফসলের গাছ পাতিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

ফসফরাস ঃ গাছের দেহকোষ তৈরি ও বেড়ে ওঠায় সাহায্য করে। শিকড়, ফুল, ফল ও বীজের জন্যেও এর দরকার। গাছের দেহে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ এই খাদ্যউপাদান দিয়ে তৈরি হয়। বিশেষ ভূমিকা নেয় সালোকসংশ্লেষে। ফসফেট যৌগ শক্তি সঞ্চয় ও সরবরাহ করে। ফুল ও ফল ধারণের ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া, গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। শুঁটি জাতীয় ফসলের শিকড়ে অবস্থিত জীবাণু (রাইজোবিয়াম), যেগুলি মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে, তার কর্মতৎপরতাও বাড়ায়।

ফসফরাসের অভাব হলে গাছ কম বাড়ে ও ফসল দেরিতে পাকে। বীজ ও দানার আকৃতি ও ওজন কমে যায়। দানাজাতীয় ফসলের গাছের পাশকাঠির সংখ্যা কম হয়। গাছের পাতা ও কান্ডে বেগুনি ও লালচে রং দেখা যায়। গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।

পটাশিয়াম ঃ গাছের ক্লোরোফিল, শ্বেতসার ও খাদ্য তৈরি এবং গাছের দেহের ভেতর পাতা থেকে শিকড়ে খাদ্য চলাচলের জন্য পটাশিয়াম দরকার। শিকড়, কান্ড ও দেহকোষের শক্তি বাড়িয়ে পটাশিয়াম গাছকে মজবুত করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। শস্যের দানা, বীজ, ফল, ফুল ও সবজির গুণগত মান বাড়াতেও এই খাদ্যউপাদানটির খুব প্রয়োজন। এছাড়া, গাছের দেহে ষাটটি উৎসেচক তৈরিতে সাহায্য করে।

পটাশিয়ামের অভাব হলে গাছ আকৃতিতে খাটো হয়ে যায়। কান্ড দুর্বল হয় ও সহজেই পাতা ঝরে পড়ে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে। গাছের পাতার ডগা থেকে শিরা বরাবর সবুজ অংশ ঝলসে বাদামী হয়ে যায়।

সালফার (গন্ধক) ঃ গাছের শিকড় বৃদ্ধি এবং পাতা ও কান্ডের সবুজ অংশ 'ক্লোরোফিল' তৈরিতে সাহায্য করে। শুঁটি জাতীয় ফসলের শিকড়ের গুটির মাধ্যমে মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে সালফার খুবই প্রয়োজনীয়। গাছের দেহে প্রোটিন, এনজাইম ও ভিটামিন তৈরি করতে এবং তৈলবীজের উৎপাদন বাড়াতেও সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম ঃ গাছের দেহকোষ তৈরিতে দরকার হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শিকড়ের ও কান্ডের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। গাছের দেহে নাইট্রোজেন খাদ্যউপাদানটি গ্রহনে ক্যালসিয়ামের ভূমিকা থাকে। কার্বোহাইড্রেট সংবহনেও সহায়তা করে।

ম্যাগনেসিয়াম ঃ গাছের সবুজ অংশ তৈরির কাজে লাগে। নিয়ন্ত্রণে রাখে মাটি থেকে গাছের নাইট্রোজেন ও ফসফরাস গ্রহন করা। পাতার সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা বাড়িয়ে এই খাদ্যউপাদান গাছের দেহে তেল জাতীয় পদার্থ ও প্রোটিন তৈরিতে সাহায্য করে।

আয়রণ (লোহা) ঃ গাছের পাতায় সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসন প্রক্রিয়ার জন্য এই খাদ্যউপাদানটির খুব দরকার। উৎসেচক তৈরিতেও সাহায্য করে। গাছের দেহে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার কাজেও আয়রনের ভূমিকা থাকে।

ম্যাঙ্গানিজ ঃ গাছের দেহে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি হতে সাহায্য করে। অক্সিন তৈরিতেও অংশ নেয়। নাইট্রোজেন অঙ্গীভূত করার কাজেও লাগে। এটি বিভিন্ন উৎসেচকের উপাদান।

বোরণ ঃ গাছের দেহে শ্বেতসার তৈরি ও অঙ্গীভূত করতে এবং প্রোটিন ও অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরির কাজে সাহায্য করে। এছাড়া, বোরণ ফুল ও ফল তৈরিতে অতি প্রয়োজনীয় এবং গাছের দেহে হরমোনের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।

জিঙ্ক (দস্তা) ঃ গাছের দেহে প্রোটিন তৈরি, ফসফরাস সংবহন ও শর্করার রূপান্তর নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া, বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করে অক্সিন ও বহু উৎসেচক তৈরিতে যার দ্বারা গাছের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়।

কপার (তামা) ঃ এটি বিভিন্ন উৎসেচকের উপাদান। কপার ডালশস্যে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে এবং ক্লোরোফিল তৈরিতে সাহায্য করে। পুরুষ ফুলের ক্ষমতা বাড়ায়।

মলিবডেনাম ঃ ডালশস্যের গাছের শিকড়ে গুঁটি তৈরিতে সাহায্য করে এই খাদ্যউপাদান। গাছের পাতায় ক্লোরোফিল তৈরিতেও কাজে লাগে। মাটি থেকে গাছের আয়রণ গ্রহন ও সংবহন এবং শর্করা তৈরিতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়।

ক্লোরিন ঃ গাছের দেহে জলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা গাছের দেহের সব প্রক্রিয়া চালু রাখে। সালোকসংশ্লেষ ও অক্সিজেন তৈরিতেও কাজে লাগে।

উপরে উল্লিখিত গাছের প্রয়োজনীয় ষোলটি খাদ্যউপাদান ছাড়াও আরো পাঁচটি খাদ্যউপাদান কিছু নির্দিষ্ট ফসলের কাজে লাগে। এদের বলা হয় উপকারী খাদ্যউপাদান, যদিও সব খাদ্যউপাদানই গাছের উপকারে লাগে। এই তালিকায় আছে সিলিকন, কোবল্ট, ভ্যানাডিয়াম, সোডিয়াম ও নিকেল।

সিলিকন ধান গাছের কোষপ্রাচীর শক্ত করে। আখ, টমাটো, শশা, সয়াবিন ফসলেরও দরকার এই খাদ্যউপাদানটি। কোবাল্ট গুঁটি জাতীয় ফসলের গাছের শিকড়ে রাইজোবিয়াম গুঁটি তৈরি এবং মাটিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধের জন্য প্রয়োজন। ফসলের উপকারী জীবাণুদের মাটিতে কার্যকারিতা সঠিক রাখতে সাহায্য করে ভ্যানাডিয়াম। পালং, বীট, নটে শাক প্রভৃতি সবজি গাছের সোডিয়াম দরকার হয়। গাছের বৃদ্ধি ও জনন প্রক্রিয়ায় নিকেলের প্রয়োজনীয়তা থাকে।

এক নজরে গাছের খাদ্য ও গ্রহনযোগ্য রূপ

খাদ্যউপাদান	জটিল অদ্রবণীয় রূপ	শস্যের গ্রহনযোগ্য রূপ
১) নাইট্রোজেন	প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রভৃতি	অ্যামোনিয়াম(NH_4^+), নাইট্রেট(NO_3^-)
২) ফসফরাস	ফাইটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, ফসফোলিপিড প্রভৃতি জৈব রূপ, খনিজ অ্যাপেটাইট রূপ; আয়রণ, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতির সঙ্গে আবদ্ধ ফসফেট	মনো হাইড্রেজেন ফসফেট(HPO_4), ডাই হাইড্রোজেন ফসফেট($H_2PO_4^-$)
৩) পটাশিয়াম	মাইকা, ফেল্ডস্পার প্রভৃতি খনিজ পদার্থ এবং ইলাইট জাতীয় কাদা কণা	পটাশিয়াম(K^+)
৪) ক্যালসিয়াম	ফেল্ডস্পার, হর্ণব্লেন্ড, ক্যালসাইট, ডলোমাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ	ক্যালসিয়াম(Ca^{++})
৫) ম্যাগনেসিয়াম	মাইকা, হর্ণব্লেন্ড, ডলোমাইট প্রভৃতি	ম্যাগনেসিয়াম(Mg^{++})
৬) সালফার	প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রভৃতি জৈবরূপ পাইরাইট, জিপসাম প্রভৃতি অজৈব রূপ	সালফাইট(SO_2^-), সালফাইট(SO_4^-)
৭) আয়রণ	অক্সাইড, সালফাইড, সিলিকেট প্রভৃতি অজৈব যৌগ রূপ	ফেরাস(Fe^{++}), ফেরিক(Fe^{+++})
৮) ম্যাঙ্গানীজ	—	ম্যাঙ্গানাস্(Mn^{++}), ম্যাঙ্গানিক্(Mn^{+++})
৯) জিংক	—	জিংক(Zn^{++})
১০) কপার	সালফাইড, হাইড্রো কার্বনেট প্রভৃতি অজৈব যৌগ	কিউপ্রাস্(Cu^+), কিউপ্রিক্(Cu^{++})
১১) বোরণ	বোরোসিলিকেট, বোরেট প্রভৃতি	বোরেট(BO_3^-)
১২) মলিবডিনাম	সালফাইড, মলিবডেট প্রভৃতি	মলিবডেট(MoO_4^-)
১৩) ক্লোরিন	ক্লোরাইড	ক্লোরাইড(Cl^-)

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ৬ ● উদ্ভিদের খাদ্যউপাদান গ্রহন ও ব্যবহার

অধ্যায় সূচি

৬.১ জৈব পদার্থ ও জৈব সার থেকে গাছের খাদ্যউপাদান গ্রহন

৬.২ রাসায়নিক সার থেকে গাছের খাদ্যউপাদান গ্রহন

জৈব বা রাসায়নিক সার যাই জমিতে দেওয়া হোক না কেন, উদ্ভিদ মাটি থেকে আয়নিক ফর্মে প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহন করে। অন্য কোন জৈব পদার্থের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এক। ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও অন্যান্য মাটির মধ্যে থাকা জীবাণু বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সারে থাকা জটিল খাদ্য পদার্থকে গাছের গ্রহনযোগ্য সহজ সরল লবণে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়ায় জীবাণুর দেহের জারক রস জৈব অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। অবাত ও স্ববাত — এই দু'ধরনের ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে স্ববাত ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনের সাহায্যে এই পচন ক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহন করে। পরে অক্সিজেনের অভাব হলে, অবাত ব্যাকটেরিয়াও এই পচনে অংশ নেয়। এদের পচন ক্রিয়া সম্পূর্ণ আলাদা। এদের দ্বারা পচন খুব ধীরে ধীরে হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল ছাড়াও কতগুলি দুর্গন্ধময় বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে।

৬.১ জৈব পদার্থ ও জৈব সার থেকে গাছের খাদ্যউপাদান গ্রহন

সাধারণত মাটিতে চাষের আগে জৈব সার ও জৈব পদার্থ প্রয়োগের পর ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে তা পচতে শুরু করে। দু'প্রকারের ব্যাকটেরিয়া জৈব সার ও জৈব পদার্থকে সহজে অজৈব পদার্থতে রূপান্তরিত করে। এরা হল হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া ও অটোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া। প্রথম প্রকারের ব্যাকটেরিয়াগুলি জৈব পদার্থ থেকে কার্বন ও শক্তি আহরণ করে। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাকটেরিয়াগুলি অজৈব পদার্থের জারণ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং কার্বন গ্রহন করে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকেও। এইসব ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা গন্ধক ও সালফার মাটিতে জারিত হয়ে উদ্ভিদ খাদ্যে পরিণত হয়। মাটিতে হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া সংখ্যায় বেশি থাকে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা পচনের আগে জৈব পদার্থের কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত সাধারণত ৮ঃ১ হয়। পচনের শুরু থেকে এই অনুপাত ক্রমশ কমতে থাকে এবং শেষে ১০ঃ১ বা ১২ঃ১-এ দাঁড়ায়। জমিতে ফসল থাকা অবস্থায় কাঁচা গোবর বা অন্য কোন জৈব পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নয়। চাষের ১-২ মাস আগে মাটিতে মেশানো যাবে।

মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগের পর তার নাইট্রোজেনঘটিত অংশ বা প্রোটিন জাতীয় অংশ থেকে নানা ভাবে নাইট্রোজেনের রূপান্তর ঘটে ঃ

(১) **অ্যামাইনিকরণ ঃ** জৈব পদার্থের প্রোটিন ভেঙে অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তর হওয়ার প্রক্রিয়াকে অ্যামাইনিকরণ বলে। হেটারোট্রপিক ব্যাকটেরিয়া এতে অংশগ্রহন করে।

(২) **অ্যামোনিয়াকরণ ঃ** এই প্রক্রিয়ায় মাটির ব্যাকটেরিয়া অ্যামাইনো নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত করে।

মাটিতে জল, বাতাসের সুবিধা থাকলে এই প্রক্রিয়া খুব ভাল ভাবে সম্পন্ন হয়। এভাবে মাটিতে তৈরি অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেনের বেশ কিছু অংশ, যেসব ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে, সেগুলিই গ্রহন করে। উদ্ভিদ দেহ গঠনের জন্য মাটি থেকে এই অ্যামোনিয়াম নেয় প্রচুর পরিমাণে। বাকি অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেনের কিছু অংশ নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়।

(৩) **নাইট্রিকরণ ঃ** অ্যামোনিয়ম নাইট্রোজেন কতগুলি বিশেষ জাতের ব্যাকটেরিয়ার দেহ নিঃসৃত জারক রসের দ্বারা জারিত হয়ে নাইট্রেট নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়। একে নাইট্রিকরণ বলে। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব ধরনের ব্যাকটেরিয়ার নাম নাইট্রোব্যাকটেরিয়া। অম্ল মাটিতে নাইট্রিকরণ ভাল হয় না।

(৪) **ডিনাইট্রিকরণ ঃ** এই প্রক্রিয়ার দ্বারা মাটির নাইট্রেট নাইট্রোজেন বিজারণ পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়।

মাটিতে জৈব সার প্রয়োগের পর এর ফসফেটঘটিত অংশ জলীয় দ্রবণে গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় এলে, গাছ তা গ্রহন করে। ফসফেট আয়নিক ফর্মে গাছ নেয়। কিছুটা আবদ্ধীকরণ প্রক্রিয়ায় মাটিতে জমা থাকে। কিছু অংশ মাটিতে থাকা জীবাণু কর্তৃক গৃহীত হয়।

জৈব সারের মধ্যে থাকা গাছের পটাশিয়াম খাদ্যউপাদানটি মাটিতে জলীয় দ্রবণে পটাশিয়াম আয়ন হিসেবে মিশলে গাছ তা গ্রহন করে আয়নিক ফর্মে। কিছুটা চুঁইয়ে নষ্ট হয়। গাছ অদরকারেও কিছুটা নেয়।

৬.৩ রাসায়নিক সার থেকে গাছের খাদ্যউপাদান গ্রহন

বিভিন্ন ফসলের চাষে রাসায়নিক সারের মাধ্যমে প্রধানত নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ খাদ্যউপাদানগুলি প্রয়োগ করা হয়। বেশ কিছুদিন ধরে এর সঙ্গে অনুখাদ্য উপাদানগুলিও প্রয়োগ করা হচ্ছে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী।

নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার মাটিতে প্রয়োগের পর জলে গুলে অ্যামোনিয়াম ও নাইট্রেট-এ রূপান্তরিত হয় এবং গাছ শিকড়ের সাহায্যে তা গ্রহন করে। নাইট্রোজেন ঘটিত সার হিসেবে আজকাল ইউরিয়া সার বেশি ব্যবহৃত হয়, যা জমিতে সরাসরি প্রয়োগ করা ছাড়াও জলে গুলে পাতায় স্প্রে করেও ব্যবহার করা যায়।

ফসফরাস ঘটিত সার হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয় সুপার ফসফেট। মাটিতে প্রয়োগের পর গাছ সারের ফসফরাস খাদ্যউপাদানটি ফসফেট আয়ন রূপে গ্রহন করে। অম্ল মাটিতে সুপার ফসফেটের ফসফরাস গাছের কাছে সহজলভ্য হয় না। এজন্য জমির মাটি সার প্রয়োগের আগেই সংশোধন করে নিতে হয়।

মিউরিয়েট অব পটাশ পটাশিয়াম ঘটিত রাসায়নিক সার। মাটির রসে দ্রবীভূত হয়ে এটি পটাশিয়াম ও ক্লোরিন আয়নে ভেঙে যায়। গাছ তখন শিকড়ের সাহায্যে মুক্ত পটাশিয়াম গ্রহন করে।

ইউরিয়া সারের মতো আয়রণ, কপার, বোরণ, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, প্রভৃতি অনুখাদ্য জলে গুলে গাছের পাতায় স্প্রে করে প্রয়োগ করা হয়। অনুখাদ্য ঘটিত রাসায়নিক পদার্থগুলি জলে গুললে খাদ্যউপাদানটি গাছের কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠে।

গাছ ক্যলসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম খাদ্যউপাদান দু'টি মাটি থেকে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন হিসেবে গ্রহন করে। সালফার নেয় সালফাইট এবং সালফেট আয়নের রূপে। ফেরাস ও ফেরিক আয়ন হিসেবে নেয় আয়রণ। ম্যাঙ্গানীজ নেয় ম্যাঙ্গানাস ও ম্যাঙ্গানিক আয়নে পরিবর্তিত হওয়ার পর। কিউপ্রাস ও কিউপ্রিক রূপে গাছ কপার গ্রহন করে। জিঙ্ক নেয় জিঙ্ক আয়ন হিসাবে। বোরণ নেয় বোরেট ও বাইবোরেট আয়নের রূপে। মলিবডেনাম গাছ গ্রহন করে মলিবডেট-এ পরিবর্তিত হলে। ক্লোরাইড আয়ন হিসাবে নেয় ক্লোরিন অনুখাদ্যটি।

ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানগুলির মধ্যে কার্বন ও অক্সিজেন গাছ সরাসরি বাতাস থেকে গ্রহন করে এবং হাইড্রোজেন নেয় জল থেকে। কার্বন কিছুটা শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকেও নিতে পারে। তবে তার পরিমাণ খুব কম। গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটি থেকে জল আহরণ করে। পাতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ স্টোমাটা দিয়ে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড প্রবেশ করে গাছের ভেতর।

নাইট্রোজেন, ফসফরাস সহ অন্য তেরোটি খাদ্যউপাদান গাছ মাটির রস থেকে শিকড়ের মাধ্যমে আহরণ করে। খাদ্যউপাদানগুলি কী পরিমাণে গ্রহনযোগ্য হবে, তা নির্ভর করে উপাদানগুলি মাটির রসে কতটুকু দ্রবণীয় আছে তার ওপর। অনেক ক্ষেত্রে মাটিতে কোনও প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদান পরিমাণে অধিক থাকলেও গাছের গ্রহনযোগ্য অবস্থায় থাকে খুব কম পরিমাণে। বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিনিময় পদ্ধতির সাহায্যে গাছের শিকড় মাটির রস থেকে খাদ্যউপাদান নেয়। এক এক ধরণের গাছের শিকড়ের এভাবে মাটি থেকে খাদ্যউপাদান নেওয়ার ক্ষমতা এক এক রকম।

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ৭ ● রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

অধ্যায় সূচি

৭.১ বিভিন্ন রাসায়নিক সারে গাছের খাদ্যউপাদানের পরিমাণ

৭.২ রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

রাসায়নিক বা অজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা, দু'টি দিকই আছে। আবার, এর ক্ষতিকারক চরিত্র বহুবছর ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে আলোচিত হচ্ছে।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হল, এই সারগুলি বাজার থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কিনতে পাওয়া যায়। খাদ্যউপাদানের উপস্থিতির পরিমাণও জৈব সারের থেকে অনেক গুণ বেশি। রাসায়নিক সার গাছের একটি খাদ্যউপাদানের হতে পারে, আবার একাধিক খাদ্যউপাদানেরও হতে পারে। এই ধরনের সারগুলিকে গাছের খাদ্যউপাদান সবসময় গ্রহনযোগ্য অবস্থায় থাকার জন্য মাটিতে প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে গাছ তা গ্রহন করতে পারে। অনেক রাসায়নিক সার মাটিতে ছড়ানো ছাড়াও জলে গুলে গাছের পাতায় স্প্রে করা যায়। জৈব সারের তুলনায় অনেক কম পরিমাণের রাসায়নিক সারে অনেক বেশি হারে গাছের খাদ্য থাকে। ফলে, সার গুদামজাত করা, বহন করা এবং প্রয়োগের জন্য মজুরখরচ কম হয়। রাসায়নিক সার প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ করা যায়।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা হল, চাষীরা এই সার নিজেদের খামারে তৈরি করতে পারেন না। কারণ, এটি কারখানায় তৈরি করে বাজারে বিক্রী করা হয়। রাসায়নিক সার সব ফসলের চাষেই সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করা দরকার। এই সার প্রয়োগে মাটির ভৌত অবস্থার কোনও উন্নতি ঘটে না। গাছের রোগপোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে। এছাড়া, রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ করা ফসলে সেচের জলের প্রয়োজন হয় বেশি। ফলে, চাষের খরচ বাড়ে। রাসায়নিক সার প্রয়োগে চাষের সবজি, ফল ইত্যাদি সুস্বাদু হয় না এবং সেগুলির সংরক্ষণের সময়ও সীমিত হয়।

রাসায়নিক সারের ক্ষতিকারক চরিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এগুলি পরিবেশ বান্ধব নয়। দীর্ঘদিন ধরে এই সার ব্যবহারের ফলে আমাদের পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে এবং জীবজগত আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের মারণ ব্যাধিতে। এর পাশাপাশি, কমে যাচ্ছে চাষের জমির মাটির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি। রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ করলে চাষের খরচ অনেক গুণ বাড়ে এবং কোনও কারণে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে চাষীর আর্থিক ক্ষতি হয় প্রচুর। রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ করলে তার প্রয়োগের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যেতে হয়। চাষের খরচ বাড়ে। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারে মাটির জৈব পদার্থের ভান্ডারে টান পড়ছে। উৎপন্ন ফসলে থাকছে রাসায়নিক সারের বিষক্রিয়া। মাটির নীচে সঞ্চিত জলভান্ডার দূষিত হয়ে যাচ্ছে প্রয়োগ করা রাসায়নিক সারের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে মিশে। মানবদেহে নানারকম রোগের এটা অন্যতম কারণ।

৭.১ বিভিন্ন রাসায়নিক সারে গাছের খাদ্যউপাদানের পরিমাণ

সারের নাম (বর্তমানে বেশি ব্যবহার হয়)	গাছের খাদ্যউপাদানের পরিমাণ (শতকরা হিসেবে)		
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম
অ্যামোনিয়াম সালফেট	২০.৬-২১.০	—	—
ইউরিয়া	৪৪-৪৬	—	—
সুপার ফসফেট (সিঙ্গল)	—	১৬	—
ট্রিপল সুপার ফসফেট	—	২৩-৩২	—
মিউরিয়েট অব পটাশ	—	—	৬০
ডাই-অ্যামোনিয়ম ফসফেট	১৮	৪৬	—
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ফসফেট	২০	২০	—
ইউরিয়া অ্যামোনিয়াম ফসফেট	২৮	২৮	—
সুফলা (১৫ঃ১৫ঃ১৫)	১৫	১৫	১৫
সুফলা (২০ঃ২০ঃ২০)	২০	২০	২০
এনপিকে (১০ঃ২৬ঃ২৬)	১০	২৬	২৬

৭.২ রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

রাসায়নিক সার বা অজৈব সার ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা দু'টি দিকই আছে। আবার, এর ক্ষতিকারক দিকটিও অবশ্য বিবেচ্য।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের সুবিধা

(১) বিভিন্ন কারখানায় উৎপাদিত রাসায়নিক সারে অধিক পরিমাণে নির্দিষ্ট গাছের খাদ্যউপাদান বা খাদ্যমৌল উপস্থিত থাকে। যেমন, ইউরিয়াতে আছে শতকরা ৪৬ ভাগ খাদ্যমৌল। কোনও সারে একটি, কোনটিতে দু'টি বা তিনটি খাদ্যমৌলও তাকে।

(২) রাসায়নিক সারে উপস্থিত খাদ্যমৌল গাছের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে। জমিতে প্রয়োগ করার পর জলে দ্রবীভূত হলে গাছ দ্রুত গ্রহন করতে পারে। অল্পদিনের মধ্যেই গাছের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

(৩) কয়েকটি রাসায়নিক সার জলে গুলে পাতায় স্প্রে করাও যায়। এতে অল্প পরিমানে সার দিয়ে গাছকে দ্রুত বড় করে তোলা সম্ভব।

(৪) কোনও ফসলের জন্য যতটা সার দেওয়া প্রয়োজন, হিসেব করে ঠিক তত পরিমানই প্রয়োগ করা যায়।

(৫) খাদ্যমৌলের উপস্থিতি অধিক থাকায়, সারের পরিমাণ লাগে কম। ফলে, সার বহন, ব্যবহার ও গুদামজাত করার কাজ সহজ হয়।

(৬) সব ফসলের চাষেই সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার সম্ভব।

(৭) চাষের জন্য যে পরিমাণ রাসায়নিক সার প্রয়োজন, পুরোটাই সংগ্রহ করা যায়।

রাসায়নিক সার ব্যবহারের অসুবিধা

(১) সহজেই জলে দ্রবণীয় হওয়ায়, জমিতে প্রয়োগের পর এই সারের অপচয় বেশি হয়। যেমন, ইউরিয়া সার জমিতে প্রয়োগের পর মোট পরিমাণ সারের ৩০-৪০ শতাংশ ফসল গ্রহন করে। বাকি অংশের কিছুটা বাতাসের সঙ্গে মিশে ও কিছুটা জলের সঙ্গে মিশে দূষণ সৃষ্টি করে।

(২) রাসায়নিক সার থেকে গাছ ৩-৪টি খাদ্যমৌল পায়। কিন্তু, গাছের প্রয়েজন ১৩টি খাদ্যমৌলের যা মাটি থেকে গ্রহন করে।

(৩) রাসায়নিক সার প্রয়োগে মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি হয় না, ক্রমশ অবনতি হয়। ফলে, ফসলের উৎপাদন ঠিক রাখতে ক্রমশ বৃদ্ধি করতে হয় সার প্রয়োগের পরিমাণ।

(৪) জমিতে মাটির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি ঠিক রাখতে ফসলের উপকারী জীবাণুরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করে। রাসায়নিক সার প্রয়োগে এইসব জীবাণুর ক্ষতি হয়। ফলে, জমির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি কমে যায়।

(৫) রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ করলে ফসল খুব তরতাজা হয়। ফলে, ফসলে রোগপোকার আক্রমণও হয় বেশি।

(৬) এই সার ব্যবহারে উৎপন্ন শাকসবজি, ফল প্রভৃতির সংরক্ষণ বেশি দিন করা যায় না। একই সঙ্গে, সুস্বাদুও হয় না।

(৭) রাসায়নিক সার দিয়ে চাষ করলে সেচের জলের প্রয়োজন বেশি হয়।

(৮) রাসায়নিক সার মোটেই পরিবেশ বান্ধব নয়। এই সার ব্যবহাররে মাটি ও বায়ু দূষিত হয়ে যাচ্ছে। দূষিত হচ্ছে ভূগর্ভের জলভান্ডার। ফসলেও এর বিষক্রিয়া থাকছে, যা মানবদেহে জন্ম দিচ্ছে বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধির।

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ৮ ● ফসলের চাষে সুষম খাদ্যউপাদান প্রয়োগ

অধ্যায় সূচি

৮.১ জৈব চাষে জৈব সার দিয়ে খাদ্যউপাদান প্রয়োগ

৮.২ সুসংহত খাদ্যউপাদান প্রয়োগের ব্যবস্থা

মাটির উর্বরতা শক্তিকে বজায় রেখে সব ফসলের চাষে লাভজনক ফলন পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগের মাধ্যমে মাটিতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানগুলির সুষম মাত্রায় প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন ধরনের সারের মধ্যে জৈব সার ও জীবাণু সার দিয়ে (গাছের) পুরো (প্রয়োজনীয় খাদ্য) প্রয়োগের কাজ করতে পারলে তা আদর্শ সুষম প্রয়োগ হবে।

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ১৬টি প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানের মধ্যে একটি বা একাধিক খাদ্যউপাদানের মাটিতে ঘাটতি হলে ফসলের গাছের বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফলন কমে। ফসলের চাষে বিভিন্ন ধরনের সারের মাধ্যমে সঠিক মাত্রায় প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদান সরবরাহের প্রধান উদ্দেশ্য, মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়িয়ে ফসলের ফলন বৃদ্ধি। সারের মাধ্যমে খাদ্যউপাদানের সুষম প্রয়োগ হলে, ফসল কাটার পরেও মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় না, যা পরবর্তী ফসলের চাষে সহায়ক হয়। সুষম খাদ্যউপাদান প্রয়োগের আগে দেখে নিতে হয় ফসলের ধরণ ও চাষের সময় এবং পদ্ধতি, যে জমি ও মাটিতে চাষ হবে তার চরিত্র ও ভৌত অবস্থা এবং মাটিতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদান কতটা পরিমাণে আছে। এসব জানার জন্যেও মাটি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

৮.১ জৈব চাষে জৈব সার দিয়ে খাদ্যউপাদান প্রয়োগ

জৈব চাষ হচ্ছে আদি চাষ, যাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ থাকে না। সব প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা হয় এই চাষ। জৈব ও জীবাণু সার সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান।

জৈব চাষে জৈব সার ব্যবহার করলে এই সার মাটিতে গাছের খাদ্যভান্ডার গড়ে তোলে। পাশাপাশি, মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ বৃদ্ধি করে। মাটির গঠন ও গ্রথনের উন্নতি হয়। ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান ও অনুখাদ্যউপাদানগুলি ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মাটির জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ে। জৈব সার প্রয়োগর পর মাটিতে তৈরি হওয়া হিউমাস মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলি বেঁধে রাখতে সাহায্য করে। এতে ভূমিক্ষয় রোধ হয়।

মাটিতে জৈব সার প্রয়োগের পর তা মাটিতে উপস্থিত বিভিন্ন উপকারী জীবাণুর প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ ধরনের জীবাণু ও মাটিতে থাকা বিভিন্ন প্রকারের অনুজীবি জৈব সার থেকে অর্ন্তনিহিত তাপশক্তি ও খাদ্যকণা পাওয়ার জন্য জৈব সারকে পচনক্রিয়ার মাধ্যমে ভাঙতে থাকে। তাপশক্তি ও খাদ্যকণা পেলে মাটিতে ফসলের উপকারী জীবাণুগুলির বংশবৃদ্ধি হয়। মাটির জৈব ও অজৈব প্রক্রিয়াগুলি এতে গতি পায়। মাটি হয় আরো প্রাণবন্ত ও উর্বর।

জীবাণুগুলি জৈব সার ভেঙে মাটিতে জৈব যৌগ হিউমাস তৈরিতে সাহায্য করে। এই হিউমাস হল মাটির প্রাণ এবং ফসলের খাদ্যভান্ডার। হিউমাসের মধ্যে থাকা কার্বন যৌগ কণা অনেক বেশি পরিমাণে অন্য খাদ্যউপাদানের কণা ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে এবং গাছের শিকড়কে জোগান দেয়। মাটিতে জল পেলে হিউমাস ফুলে ওঠে। এজন্য জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ মাটি বেশি মাত্রায় জলধারণ করার ক্ষমতা রাখে।

জৈব সার মাটির মধ্যে আবদ্ধ ও অদ্রবণীয় গাছের খাদ্যউপাদানগুলি শিকড়ের দ্বারা গ্রহনের জন্য সহজ লভ্য করে তোলে। মাটিতে প্রয়োগের পর জৈব সারের পচনক্রিয়া চলাকালীন নির্গত জৈব রসায়ন মাটিতে আবদ্ধ ও অদ্রবণীয় ফসফেট ও অনুখাদ্যগুলিকে গাছের গ্রহনযোগ্য অবস্থায় পরিবর্তিত করে।

জৈব সারে গাছের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খাদ্যউপাদানগুলি থাকায়, এই সার প্রয়োগের মাধ্যমে ফসলের চাষে সুষম খাদ্যউপাদান প্রয়োগ করা যায়। তবে, জৈব সারে খাদ্যউপাদানগুলি রাসায়নিক সারের তুলনায় খুব কম পরিমাণে থাকে। এজন্য, জৈব সার রাসায়নিক সারের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে জমিতে দিতে হয়। তবে, জৈব সারের মধ্যে থাকা গাছের খাদ্যউপাদানগুলি মাটিতে ধীরে ধীরে গাছের কাছে গ্রহনযোগ্য হয় বলে, অপচয় হয় কম।

জৈব চাষে বিভিন্ন ধরনের জৈব সার চাষীরা নিজের খামারে তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন। এই তালিকায় আছে খামারের সার, গোবর সার, গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সার, সবুজ সার, নীলাভ সবুজ শ্যাওলা ও অ্যাজোলা, খইল, জীবাণু সার, কম্পোস্ট বা মিশ্র জৈব সার, ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার প্রভৃতি। কোন জৈব সারে গাছের খাদ্যউপাদান কী হারে থাকে, নীচের তালিকায় দেওয়া হল।

বিভিন্ন জৈব সারে গাছের খাদ্যউপাদানের পরিমাণ

সারের নাম	গাছের খাদ্যউপাদানের পরিমাণ (শতকরা হিসেবে)		
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম
খামারের সার	০.৫-১.৫	০.৪-০.৮	০.৫-১.৯
আবর্জনা পচা সার (কম্পোস্ট)	০.৪-০.৮	০.৩-০.৬	০.৭-১.০
গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সার	১.৬-১.৮	১.১-২.০	০.৮-১.২
গোবর সার	০.৫	০.২৫	০.৫
সবুজ সার (ধইঞ্চা)	০.৬২	০.১৫	০.৫৮
সবুজ সার (শন)	০.৭৫	০.১২	০.৫১
খইল (সরষে)	৫.১-৫.২	১.৮-১.৯	১.১-১.২
খইল (বাদাম)	৭.০-৭.৩	১.৫-১.৬	১.৩-১.৪
খইল (তিল)	৬.২-৬.৩	২.০-২.১	১.২-১.৩
খইল (তিসি)	৫.৫-৫.৬	১.৪-১.৫	১.২-১.৩

সারের নাম	গাছের খাদ্যউপাদানের পরিমাণ (শতকরা হিসেবে)		
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম
খইল (নিম)	৫.২-৫.৩	১.০-১.১	১.৪-১.৫
খইল (মহুয়া)	২.৫-২.৯	০.৮-০.৯	১.৮
খইল (সূর্যমুখী)	৫.০	১.৫	১.৮
হাড় গুঁড়ো	২.০-৪.০	২০.০-২৫.০	—
মুরগির খামারের সার	১.০-১.৮	১.৪-১.৮	০.৮-০.৯
কেঁচো সার (ভার্মিকম্পোস্ট)	১.০-১.৫	১.৮-২.২	১.০-১.৫

৮.২ সুসংহত খাদ্যউপাদান প্রয়োগের ব্যবস্থা

মাটির উর্বরা শক্তিকে বজায় রেখে বরাবর জমি থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়ার জন্য প্রয়োজন জৈব ও জীবাণু সার এবং রাসায়নিক সারের সুষম প্রয়োগ।

ফসলের চাষে সুসংহত পদ্ধতিতে গাছের খাদ্যউপাদান প্রয়োগের জন্য প্রথম প্রয়োজন যে জমিতে ফসল চাষ করা হবে তার মাটির নমুনা পরীক্ষা। এই পরীক্ষা করলে জানা যাবে, মাটিতে মিশে থাকা দ্রবণীয় লবণের পরিমাণ, মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব কতটা এবং মাটিতে উপস্থিত গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানের পরিমাণ। পরীক্ষা করে যদি দেখা যায়, মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব স্বাভাবিক নয়, তাহলে উপযুক্ত সংশোধক সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ করে মাটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা দরকার। এবার এই স্বাভাবিক মাটিতে মাটি পরীক্ষার ফলাফল দেখে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করলে সারের জন্য খরচ পড়বে কম, শস্যের ফলন হবে বেশি এবং মাটির উর্বরতা শক্তিও বজায় থাকবে।

দ্বিতীয় প্রয়োজন, সার প্রয়োগের সময় জৈব সার ও জীবাণু সার প্রয়োগে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। রাসায়নিক সার না দিতে পারলেই সবচেয়ে ভাল। জৈব সার হচ্ছে প্রকৃতির তৈরি যথার্থ সুষম খাদ্যউপাদান সরবরাহকারী সার। জৈব সারের গুণাগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। রাসায়নিক সার গাছের খাদ্যউপাদান সরবরাহ করা ছাড়া মাটি বা ফসলের অন্য কোনও উপকারে আসে না।

ফসলের চাষে সুসংহত খাদ্যউপাদান প্রয়োগের ব্যবস্থায় জৈবসারের মতো জীবাণু সারও বিশেষ ভূমিকা নেয়। জীবাণু সারও মাটির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। অ্যাজোটোব্যাক্টর, অ্যাজোস্পিরিলিয়াম প্রভৃতি জীবাণু সারের প্রয়োগ ফসলের চাষে একর প্রতি প্রায় ১০-১২ কেজি নাইট্রোজেন খাদ্যউপাদান সরবরাহ করতে সক্ষম, যা রাসায়নিক সারের হিসেবে প্রায় ৪০-৪৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগের সমান। জীবাণু সার বায়বীয় নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ করে গাছকে সরবরাহ করার পাশাপাশি মাটিতে হরমোন ও উৎসেচক তৈরি এবং গাছের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

এক্ষেত্রে, জীবাণু সারের উপকারী জীবাণু রোগের জন্য দায়ী ক্ষতিকারক জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলে। সুসংহত খাদ্যউপাদান প্রয়োগের ব্যবস্থায় যে কোনও ফসল চক্রে একটি শুঁটিজাতীয় ফসলের চাষ অবশ্যই অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। কারণ, শুঁটিজাতীয় ফসল, যেমন ডালশস্যের চাষ করলে, রাইজোবিয়াম জীবাণু সার একর প্রতি ২৫-৩০ কেজি পর্যন্ত নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ করে।

নাইট্রোজেনের মতো মাটিতে ফসফেট দ্রবণকারী এবং পটাশ ও সালফার সরবরাহকারী জীবাণু সার প্রয়োগ করলে গাছের প্রয়োজনীয় এই তিনটি খাদ্যউপাদানও নাইট্রোজেনের সঙ্গে কম খরচে জোগান দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, মাটিতে জীবাণু সারের কার্যক্ষমতা সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য জৈব সার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি।

সুসংহত খাদ্যউপাদান প্রয়োগ ব্যবস্থার তৃতীয় ও শেষ প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে ফসলের চাষে রাসায়নিক সার প্রয়োগ। জৈব সার ও জীবাণু সারের মাধ্যমে কোনও ফসলের চাষে পুরো খাদ্যউপাদান প্রয়োগের প্রয়োজন মেটানো না গেলে, বাকি পরিমাণ খাদ্যউপাদান রাসায়নিক সারের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এভাবে রাসায়নিক সার দিলে, রাসায়নিক সার পরিমাণে লাগবে কম এবং খরচেও সাশ্রয় হবে। একই সঙ্গে ক্ষতি কম হবে মাটি, পরিবেশ ও জীবজগতের।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে জমির পরিমাণ ক্রমশ কম হওয়ার জন্য সকলের খাদ্যবস্ত্র সংস্থান করতে হলে জমিতে নিবিড় চাষ বাড়াতে। পাশাপাশি, চাষ করতে হবে বিভিন্ন ফসলের হাইব্রীড ও উচ্চফলনশীল জাত।

একটি ফসল জমি থেকে কতটা পরিমাণে খাদ্যউপাদান গ্রহন করে

ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদন (কেজিতে)	খাদ্যউপাদান গ্রহনের পরিমাণ (কেজিতে)		
		নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম
বোরোধান	২৪০০	৩৫	৯	৪৪
গম	১২০০	৪০	১৬	৬০
আলু	১০৪০০	৫৪	১০	৬০

এক জমিতে ২-৩টি ফসল চাষ করলে প্রয়োজনীয় পরিমাণে খাদ্যউপাদান সরবরাহ করার জন্য যে পরিমাণ জৈব ও জীবাণু সার দেওয়া দরকার, বাস্তবে তা জোগাড় করে জমিতে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় গবাদি পশুর সংখ্যা খুবই কমে গেছে এবং কমেছে গোবর সংগ্রহের পরিমাণ।

এই পরিস্থিতিতে সুসংহত সার প্রয়োগের জন্য দরকার, মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিটি ফসল চাষের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদান প্রয়োগের পরিমাণ জেনে যতটা সম্ভব জৈব সার এবং নির্দিষ্ট জীবাণু সার প্রয়োগ করে, বাকি খাদ্যউপাদান রাসায়নিক সারের মাধ্যমে দেওয়া। সঠিক পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে, এর অপচয় এবং ক্ষতিকারক ক্রিয়া বহুলাংশে কমানো যাবে। একই সঙ্গে, সম্ভব হবে জমির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি বজায় রাখা।

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ৯ ● জৈব কৃষিতে গাছের খাদ্যউপাদান সরবরাহের উৎস

অধ্যায় সূচি

৯.১ জৈব সারের প্রকার ভেদ

৯.২ খামারের সার

৯.৩ গোবর গ্যাস ও গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সার

৯.৪ সবুজ সার

৯.৫ নীলাভ সবুজ শ্যাওলা ও অ্যাজোলা

৯.৬ খোল বা খইল সার

৯.৭ প্রাণীজ জৈব সার

৯.৮ আবর্জনা বা ময়লা সার ও তলানি সার

৯.৯ তরল সার

৯.১০ জৈব সারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও খাদ্যউপাদানের উপস্থিতি

জৈব পদার্থ থেকে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন সারই হল জৈব সার। কম্পোস্ট, গোবর সার, সবুজ সার, খামারের আবর্জনা পচা সার, কেঁচো সার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের জৈব সার। চাষের কাজে জৈব সারের ব্যবহার সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। বর্তমান যুগে রাসায়নিক সার ব্যবহারের কুফল যত প্রকট হচ্ছে, গুরুত্ব বাড়ছে জৈব সারের বর্ধিত ব্যবহারের।

জৈব সার মাটিতে প্রয়োগের পর দীর্ঘদিন ধরে গাছকে খাদ্যউপাদান জোগাতে সক্ষম হয়। মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি করে ও জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। মাটিতে জৈব সারের পচন সম্পূর্ণ হলে খাদ্যউপাদানগুলি ধীরে ধীরে গাছের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ফলে, মাটিতে নষ্ট হয় না গাছের খাদ্য। জৈব সার প্রয়োগে পরিবেশ দূষিত হয় না। জীবজগতের ওপরও পড়ে না কোন ক্ষতিকারক প্রভাব।

৯.১ জৈব সারের প্রকার ভেদ

বিভিন্ন প্রকার জৈবসারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) খামারের সার

(খ) গোবর গ্যাস ও গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সার

(গ) সবুজ সার

(ঘ) নীলাভ সবুজ শ্যাওলা ও অ্যাজোলা

(ঙ) খোল / খইল

(চ) প্রাণীজ জৈবসার

(ছ) আবর্জনা বা ময়লা সার ও তলানি সার

(জ) মিশ্র জৈবসার বা কম্পোস্ট*

(ঝ) কেঁচো সার*

(* কম্পোস্ট ও কেঁচো সার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আলাদা অধ্যায়ে আছে)

৯.২ খামারের সার

কৃষি খামারের বিভিন্ন পশুপাখির মলমূত্র এবং অন্যান্য আবর্জনা বা বর্জ্য পদার্থকে ভালোভাবে পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকে খামারের সার বা ফার্ম ইয়ার্ড ম্যানিওর বলা হয়। এটি একটি অত্যন্ত উন্নতমানের জৈবসার।

খামারের সার তৈরির জন্য গোশালার কাছাকাছি একটি উঁচু জায়গায় ৩ মি. x ১.৫মি. x ১০ মিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি গর্ত খুঁড়তে হবে। গর্তটি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো হলে ভালো হয় কারণ, তাতে খাদ্যউপাদানগুলি মাটিতে চুঁইয়ে যাওয়ার বা নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম থাকে। গর্তটি মাটির হলে গর্তের তলাটি ভালো করে পিটিয়ে নেওয়া দরকার। গর্তটিকে সমান কয়েকটি ভাগে ভাগ করে কাঠের তক্তা জাতীয় জিনিষ দিয়ে সাময়িকভাবে আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে ভাগ করে নিতে হয়।

খামারের পশুর মলমূত্র, খাদ্যের অবশেষ, আগাছা, তরকারির খোসা, খামার ও ঘরবাড়ির বর্জ্য আবর্জনা ইত্যাদি একসঙ্গে মিশিয়ে গর্তের এক একটি প্রকোষ্ঠ ভরতে হবে। গর্তটি ভর্তি হয়ে গেলে কাদা ও গোবরের প্রলেপ দিয়ে আবর্জনার স্তূপটি ঢেকে দিতে হবে। প্রায় ৪-৫ মাসের মধ্যেই সার তৈরি হয়ে যায়। গর্ত প্রতি ৩০-৪০ কেজি সুপার ফসফেট ভালো করে মিশিয়ে দিলে সারের মধ্যে ফসফেটের পরিমাণ বাড়ে ও মান উন্নত হয়। গোশালাটি এমনভাবে তৈরী করতে হবে যে, গোমূত্র ও মল সবটাই সংগ্রহ করা যায়।

৯.৩ গোবর গ্যাস ও গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সার

সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত জৈবসার হল গোবর সার। গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ গোবর জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। আবার গোশালা থেকে গোবর সংগ্রহ করার সময় গোমূত্র অনেক সময় সংগ্রহ করা হয় না। ফলে পুষ্টিমৌলের পরিমাণ অনেকটাই হ্রাস পায়। এই ত্রুটিগুলি সহজেই শুধরে নেওয়া সম্ভব। গোবর গ্যাস তৈরির পর যে অবশিষ্টাংশ বের হয়, তা জৈবসার হিসাবে অতি উৎকৃষ্ট এবং এই জৈব সারকে কাজে লাগিয়ে ২৫-৩০ শতাংশ বেশি ফসল উৎপাদন করা যায়। বাড়িতে ৩-৪টি গরু থাকলে অথবা কাছাকাছি গোশালা থাকলে, গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট বাড়িতেই বসানো যায়। প্ল্যান্ট থেকে তৈরি হওয়া সার ছায়ায় একটু শুকিয়ে নিয়ে সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা যাবে।

৯.৪ সবুজ সার

জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সবুজ গাছপালা চাষ করে নরম অবস্থায় লাঙ্গল বা ট্রাক্টর দিয়ে চষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া (সবুজ সার) অথবা কিছু কিছু গাছের নরম সবুজ পাতা ও পাতা সংলগ্ন নরম ডাঁটা কেটে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার (সবুজ পাতাসার) পদ্ধতিই হল সবুজ সার প্রয়োগ পদ্ধতি।

সবুজ সার প্রয়োগের উপকারিতা

(১) সবুজ সার উৎপাদনকারী শুঁটিজাতীয় ফসলগুলি হেক্টর প্রতি ১০-২৫ টন সবুজ সার উৎপাদন করে। এদের মাধ্যমে যা পুষ্টি উপাদান মাটিতে সংযুক্ত হয় তার পরিমাণ প্রায় ৩-৮ টন খামার সারের সমতুল্য।

(২) সবুজ সার হেক্টর প্রতি ৬০-১০০ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যোগ করে; তাছাড়া ফসফরাস, পটাশ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা ইত্যাদি উপাদানের সহজলভ্যতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ে।

(৩) সবুজ সার তৈরির ফসলগুলি মাটিকে ঢেকে রাখে। ফলে, পুষ্টিমৌলের হ্রাসের পরিমাণ কমে যায়। মাটি সংরক্ষিত হয়। মাটির ক্ষয় কম হয়।

(৪) মাটির উপকারী জীবাণুগুলির কার্যকারিতা বাড়ে, জমিতে হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৫) জমির জলধারণ ক্ষমতা, বায়ু চলাচল ক্ষমতা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থার উন্নতি ঘটে।

(৬) দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে জমির ক্ষারত্বের পরিমাণ কমে। মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়া স্বাভাবিক হয়।

(৭) সাধারণত শুঁটিজাতীয় ফসল সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এরা বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেনকে মূলের অর্বুদের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে এবং মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ অনেকটা বাড়ে। মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ হয়।

সবুজ সারের উপযোগী ফসল

সবুজ সার তৈরির উপযোগী ফসলগুলিকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) **শিম্বীগোত্রীয় শস্য ঃ** ধঞ্চে, বরবটি, শণ, বিউলি অড়হর, সেসবানিয়া, বুনো নীল, বাঘাধঞ্চে, সয়াবিন, মটর, ছোলা, খেসারি ইত্যাদি।

(খ) **সবুজ পাতাসারের জন্য ফসল ঃ** কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, গ্লাইরিসিডিয়া, স্থলকলমি, ক্লোটোলারিয়া, সুবাবুল, সেসবানিয়া, ক্যাসিয়া ইত্যাদি গাছের পাতা।

সবুজ সারের উপযোগী শস্যের বৈশিষ্ট্য

(১) কান্ড নরম, শাঁসালো হবে, গাছের পাতার পরিমাণ বেশি থাকবে।

(২) গাছের ফুল ও ফল আসার সময় দীর্ঘ হবে। তবে গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়বে।

(৩) গাছের মূল মাটির গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে এবং তাতে মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৪) সব রকমের মাটিতে এবং সহজে চাষ করা যাবে অর্থাৎ সব পরিস্থিতিতে চাষ করার যোগ্য হবে।

সবুজ সার প্রয়োগের পদ্ধতি

খরিফ ঋতুতে সাধারণত জুন-জুলাই মাসে সবুজ সার প্রয়োগ করা হয়। এর জন্য সাধারণত মে মাস নাগাদ সবুজ সার উৎপাদনের শস্যগুলি লাগানো হয়। সবুজ সারের শস্যগুলি মূলত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। তবে, নিয়মিত বৃষ্টি না হলে ১০-১২ দিন অন্তর জমিতে জলসেচ দিতে হয়।

সবুজ সার হিসেবে শুঁটিজাতীয় ফসল চাষ করা হলে ফসফেট প্রয়োগ করা দরকার। এই জাতীয় ফসলের শিকড়ের গুটিতে বসবাসকারী জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেন বন্ধনে সাহায্য করে।

কচি ও নরম অবস্থায় সবুজ সারের গাছকে জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। ডাঁটা শক্ত হয়ে গেলে সহজে পচন হয় না। পচনের জন্য প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। সেইজন্যই সেচের বন্দোবস্ত না থাকলে খরাপ্রবণ এলাকায় সবুজ সার ব্যবহার করার অসুবিধা আছে। শুঁটিজাতীয় ফসলগুলিকে সাধারণত ৫-৬ সপ্তাহ বয়সে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে জমির মাটির গুণাগুণ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সঠিকভাবে বজায় থাকে।

গাছগুলি জমিতে মেশানোর ৪-৫ সপ্তাহ পরে জমিতে মূল অর্থাৎ প্রধান ফসল চাষ করা যায়।

সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফসলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শস্যের নাম	বপনের সময়	বীজের হার (হেক্টর প্রতি কেজিতে)	হেক্টর প্রতি সবুজ অংশ উৎপাদন (টন)	শস্যে নাইট্রোজেনের ভাগ (শতাংশ)	হেক্টর প্রতি নাইট্রোজেন উৎপাদনের পরিমাণ (কেজিতে)
শন	এপ্রিল-জুলাই	৫০-৬০	১৮-২৮	০.৪৩	৬০-১০০
ধইঞ্চা	এপ্রিল-জুলাই	৪০-৪৫	২০-২৫	০.৪২	৮৪-১০৫
বিউলি	এপ্রিল-জুলাই	২০-২২	১০-১২	০.৪১	৪০-৪৯
মুগ	এপ্রিল-জুলাই	২০-২২	৮-১০	০.৪৮	৩৮-৪৮
গুয়ার	এপ্রিল-জুলাই	৩০-৪০	২০-২৫	০.৩৪	৬৪-৬৫
জোয়ার	এপ্রিল-জুলাই	৪০-৫০	২০	০.৩৪	৫৬
সেনজি	অক্টোবর	২৫-৩০	২৬-২৯	০.৫১	১২০-১৩৫
বারসিম	ডিসেম্বর	২০-৩০	১৬	০.৪৩	৬০
মটর	অক্টোবর	৮০-১০০	২১	০.৩৬	৬৭

৯.৫ নীলাভ সবুজ শ্যাওলা ও অ্যাজোলা

অ্যাজোলা হল জলে ভাসমান একটি ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ। এই অ্যাজোলার পাতার উপরের অংশে নীলাভ সবুজ শৈবাল বসবাস করে, যা বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করতে সক্ষম। নীলাভ সবুজ শ্যাওলা সূর্যের উপস্থিতিতে প্রতি হেক্টরে ৩০-৪০ কেজি পর্যন্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে পারে। অন্যদিকে অ্যাজোলা ধানের জমিতে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করলে যথেষ্ট পরিমাণে জৈবসার এবং হেক্টর প্রতি ২৫-৩০ কেজি নাইট্রোজেন উৎপন্ন বা যোগ করতে পারে। জমিতে নীল সবুজ শ্যাওলা শুকনো করেও জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সবুজসার হিসেবে অ্যাজোলার ব্যবহার

ধান রোয়ার অন্তত ২০ দিন আগে জমিতে ভালোভাবে চাষ দিয়ে ১০-১৫ সেমি জল ধরে রাখা হয়। এরপর, ঐ জমিতে একর প্রতি ৮০০ কেজি অ্যাজোলা ছড়িয়ে দিয়ে ৩০-৩৫ কেজি রক ফসফেট প্রয়োগ করা হয়। ২০ দিন পর অ্যাজোলা জমিকে প্রায় ঢেকে ফেলে, যার ওজন প্রায় ৬-৮ টন। এরপর ঐ জমিতে চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে অ্যাজোলা মিশিয়ে দেওয়া হয়।

ধানের সঙ্গে অ্যাজোলার চাষ

ধান রোয়ার ৫-৭ দিন পর একর প্রতি ২০০-৪০০ কেজি সতেজ অ্যাজোলা ধানের জমিতে প্রয়োগ করা হয়। জমিতে অ্যাজোলা দেওয়ার পর রক ফসফেট দিলে অ্যাজোলার বৃদ্ধি ভালো হয়।

অ্যাজোলা ফসলকে নাইট্রোজেন জোগান দেওয়া ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে জৈবসার জোগান দেয় এবং জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

৯.৬ খোল বা খইল সার

বিভিন্ন তৈলবীজ থেকে তেল বের করে নেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে খোল বলে। তৈলবীজ ছাড়াও নিম, করঞ্জা, মহুয়া, তুলোবীজ থেকেও খোল পাওয়া যায়। খোলের মধ্যে অন্যান্য জৈবসারের তুলনায় উদ্ভিদ খাদ্যউপাদানগুলি বেশি পরিমাণে থাকে।

বীজ বোনা বা রোয়ার ১৫-২০ দিন আগে জমিতে খোল প্রয়োগ করা উচিত। প্রায় ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে খোল পচে এবং এর মধ্যে থাকা উদ্ভিদ খাদ্যের প্রায় ৫০-৮০ শতাংশ উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। তবে মহুয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি সময় লাগে। তাই প্রায় ২ মাস আগে মহুয়ার খোল জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। খোল পচার জন্য জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা দরকার। এছাড়া জমিতে সেচেরও সুবিধা থাকা আবশ্যক। ব্যবহারের আগে খোলকে ভালোভাবে গুঁড়ো করে নিতে হয়।

আখ, তুলা, শাকসবজি, আলু, ফল তামাক, ধান, গম ইত্যাদি ফসলের ক্ষেত্রে খোল ব্যবহার করা হয়। ফুল ও পান চাষে খোল সার প্রয়োগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নিম, করঞ্জা, রেড়ি ও মহুয়ার খোল তেতো স্বাদের হয়। জমিতে কীটপতঙ্গ দমনের ক্ষেত্রে এগুলি সাহায্য করে।

বিভিন্ন প্রকার খোল থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিদ খাদ্যের শতকরা পরিমাণ

খোলের নাম	নাইট্রোজেন (%)	ফসফরাস (%)	পটাশ (%)
সরষের খোল	৪.৫-৫.০	২.০	১.৩-১.৫
বাদামের খোল	৬.৫-৭.৫	১.৩-১.৫	১.৫
নিম খোল	৫.০-৫.৫	১.০	১.২-১.৪
মহুয়া খোল	২.০-২.৫	০.৮-১.০	১.৮-২.০
তিলের খোল	৬.০-৬.২	২.০	১.২-১.৪
তিসির খোল	৪.৯-৫.০	১.৪-১.৫	১.৩-১.৪
করঞ্জা খোল	৪.৯-৫.০	০.৯-১.০	১.২
নারকেল খোল	৩.৯-৪.০	১.৯-২.০	১.৮
নাইজার খোল	৪.৮	১.৮	১.৩-১.৪
ক্যাস্টর বা সরগুজার খোল	৫.৫-৫.৯	২.৮	২.০-২.১
তুলো (খোসা সহ)	৩.৯-৪.০	১.৮	১.৬-১.৭

৯.৭ প্রাণীজ জৈব সার

হাড়ের গুঁড়ো, মাছের গুঁড়ো, রক্তের গুঁড়ো, মাংসের গুঁড়ো, পাখির মাংসের গুঁড়ো ইত্যাদি হল বিভিন্ন রকমের প্রাণীজ জৈবসার। এগুলি জলে অদ্রাব্য। কিন্তু মাটিতে প্রয়োগের পর বিভিন্ন জীবাণুর ক্রিয়ায় এদের মধ্যস্থ উদ্ভিদ খাদ্যউপাদান, মূলত ফসফেট ও নাইট্রোজেন ধীরে ধীরে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। তাই এই সারের কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী। বিভিন্ন রকম প্রাণীজ জৈবসার থেকে প্রাপ্ত খাদ্যউপাদানের শতকরা পরিমাণ নিচে দেওয়া হল।

জৈব সারের নাম	নাইট্রোজেন (%)	ফসফরাস (%)	পটাশ (%)
হাড়গুঁড়ো সার	৩.৫-৪.৫	১৮-২৫	—
শিং ও খুর গুঁড়ো সার	১০.০-১৫.০	১.০	—
রক্তের গুঁড়ো সার	১০.০-১২.০	১.০-২.০	১.০
মাংসের গুঁড়ো সার	৯.০-১১.০	০.১-৩.৫	—
মাছের গুঁড়ো সার	৪.০-১০.০	৩.০-৯.০	০.৩-১.৫

৯.৮ আবর্জনা বা ময়লা সার ও তলানি সার

শহরের নর্দমা ও অন্যান্য পয়ঃপ্রণালীর তলায় প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ খাদ্যউপাদান থাকে, যাকে তলানি সার বলে। কিন্তু অশোধিত অবস্থায় এই সার ব্যবহার করলে জমির ভৌত ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি কিছু পরিমাণে বিঘ্নিত হয়। তাই সিউয়েজ খামারে তলানি সার থিতানোর জন্য মেশিন বসিয়ে বাণিজ্যিকভাবে সার তৈরি করা হয়। তলানি সার থেকে কম খাদ্যোপাদান যুক্ত কাদার কণা বাদ দিয়ে, নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পচিয়ে পচানো তলানি সার পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোন অবস্থাতেই তলানি সার দেওয়া জমির ফসল কাঁচা অবস্থায় খাওয়া উচিত নয়।

৯.৯ তরল সার

গোবর, গোমূত্র, ঝোলা গুড়, আখের রস, গাছের পাতা, কলা ইত্যাদি একসঙ্গে পচিয়ে, ছেঁকে তরল সার তৈরি করা হয়। তরল সারের সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণে জল মিশিয়ে সকালে অথবা বিকেলে জমিতে গাছের গায়ে প্রয়োগ করতে হবে। গাছের পাতায় স্প্রে করেও দেওয়া যায়। তরল সার ফসলের গাছকে শক্তসমর্থ করে, রোগপোকা প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায় ও ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে। একবার বানিয়ে ঠান্ডা ও ছায়া আছে এমন জায়গায় রাখলে ৪-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত এর গুণাগুণ বজায় থাকে।

মাটিকে জৈব খাদ্যে সমৃদ্ধ করার জন্য সুপারিশকৃত তরল সার

(১) **সঞ্জীবক ঃ** ২০ কেজি গোবর, ১০ লিটার গোমূত্র, ৫০০ গ্রাম ঝোলা-গুড়, ৩০ লিটার জলে গুলে আবদ্ধ ড্রামে ১০ দিন পচানো হয়। তারপর ওই মিশ্রণ জলে মিশিয়ে ২০ গুণ বৃদ্ধি করে মাটিতে বা সেচের জলের সাথে ১ একর জায়গাতে প্রয়োগ করা হয়।

(২) **পঞ্চগব্য ঃ** ৪ কেজি গোবর গোলা, ১ কেজি টাটকা গোবর, ৩ লিটার গোমূত্র, ২ লিটার গোরুর দুধ, ২ লিটার দই, ১ কেজি বাটার অয়েল মিশিয়ে ৭ দিন আবদ্ধ পাত্রে পচানো হয়। প্রত্যেহ ২ বার করে নাড়ানো হয়। ২০ লিটার পঞ্চগব্য জলে গুলে ৬৫০ লিটার মিশ্রণ তৈরি করে ১ একরে স্প্রে করা হয়। বীজ শোধনের কাজেও এটি ব্যবহার করা হয়।

(৩) **সমৃদ্ধ পঞ্চগব্য ঃ** ১ কেজি টাটকা গোবর, ৩ লিটার গোমূত্র, ২ লিটার গোরুর দুধ, ২ লিটার দই, ১ কেজি দেশি ঘি, ৩ লিটার আখের রস, ৩ লিটার নারকেলের জল, ১২টি কলা একসঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে আবদ্ধ পাত্রে ৭ দিন পচানো হয়। ২০ লিটার এই মিশ্রণে ৬৫০ লিটার জল গুলে ১ একর জমির মাটির ওপরে স্প্রে করে সেচ দেওয়া হয়।

(৪) **জীবাম্রুত ঃ** ১০ কেজি গোবর, ১০ লিটার গোমূত্র, ২ কেজি ঝোলা গুড়, ২ কেজি গমের ময়দা ও ২ কেজি অনুজীবি যুক্ত মাটি ২০০ লিটার জলে গুলে ৫-৭ দিন পচানো হয়। পচানোর সময়

প্রতিদিন ৩ বার দ্রবণটিকে নাড়ানো হয়। ঐ মিশ্রণ সেচের জলের সঙ্গে মিশিয়ে এক একরে প্রয়োগ করা হয়। একটি ফসলে মোট ৩ বার প্রয়োগ করা উচিৎ। প্রথমবার বীজ বোনার আগে, দ্বিতীয় বার বীজ বোনার ২০ দিন পর এবং তৃতীয় তথা শেষ বার ৪৫ দিন পর।

৯.১০ জৈব সারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও খাদ্যউপাদানের উপস্থিতি

জৈবসারের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

(১) প্রয়োজনীয় সবরকম উদ্ভিদ খাদ্যউপাদানই জৈবসারে পাওয়া যায়, যদিও এগুলির পরিমাণ কম থাকে।

(২) জৈবসারের মধ্যে থাকা খাদ্যউপাদানগুলি ধীরে ধীরে উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহনযোগ্য অবস্থায় আসে।

(৩) জৈবসার মাটির গঠন ও গ্রথনের উন্নতি ঘটায় এবং ভূমিক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

(৪) জৈবসার প্রয়োগের ফলে মাটির বায়ু চলাচল ক্ষমতা ও জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৫) মাটিতে অবস্থিত জীবাণুর কার্যতৎপরতা বা কার্যকারিতা বাড়ায়। এর ফলে রাসায়নিক সারের লভ্যতা বা কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ফসল বেশি করে খাদ্যউপাদান পায়।

বিভিন্ন জৈবসারে গাছের খাদ্যউপাদানের উপস্থিতি

জৈব সারের নাম	উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ (শতকরা হিসাব)		
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম
খামারের সার	০.৫-১.৫	০.৪-০.৮	০.৫-১.৯
শহরাঞ্চলের আবর্জনা পচা সার	১.০-২.০	১.০	১.৫
গ্রামের আবর্জনা পচা সার (কম্পোস্ট)	০.৪-০.৮	০.৩-০.৬	০.৭-১.০
গোবর সার (গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের)	১.৬-১.৮	১.১-২.০	০.৮-১.২
কাঠের ছাই	০.৫-১.৯	১.৬-৪.২	২.৩-১২.০
গোবর সার	০.৫	০.২৫	০.৫
সবুজ সার (ধইঞ্চা)	০.৬২	০.১৫	০.৫৮
সবুজ সার (শণ)	০.৭৫	০.১২	০.৫১
সবুজ সার (বরবটি)	০.৭৫	০.১৫	০.৫৮
সরষের খোল	৫.১-৫.২	১.৮-১.৯	১.১-১.২
বাদাম খোল	৭.০-৭.৩	১.৫-১.৬	১.৩-১.৪
তিল খোল	৬.২-৬.৩	২.০-২.১	১.২-১.৩
নিম খোল	৫.২-৫.৩	১.০-১.১	১.৪-১.৫
সূর্যমুখী খোল	৫.০	১.৫	১.৮

জৈব সারের নাম	উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ (শতকরা হিসাব)		
	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম
নারকেল খোল	৩.০-৩.২	১.৯-২.০	১.৭-১.৮
কুসুম খোল	৪.৯	১.৪	১.২
তুলাবীজের খোল	৩.৯	১.৮	১.৬
মহুয়া খোল	২.৫-২.৯	০.৮-০.৯	১.৮
রেড়ির খোল	৪.৩	১.৮	১.৩
তিসির খোল	৫.৫-৫.৬	১.৪-১.৫	১.২-১.৩
হাড় গুঁড়ো (অশোধিত)	২.০-৪.০	২০.০-২৫.০	—
মাছ গুঁড়ো	৪.০-১০.০	৩.০-৯.০	০.৩-১.৫
রক্তের গুঁড়ো	১০-১২	১-২	১
পোল্ট্রি সার	১.৪৭	১.১৫	০.৪৮
গবাদি পশুর মলমূত্রের মিশ্রণ	০.৬০	০.১৫	০.৪৫
কচুরিপানা	২.০	১.০	২.৩
ধানের তুষ	০.৩-০.৪	০.২-০.৩	০.৩-০.৫
পুকুরের পাঁক	০.৩	০.৩	০.৩
তামাক পাতার বর্জ্য	০.৫-১.০	০.৮	০.৮
গোবর (টাটকা)	০.৩-০.৪	০.১-০.২	০.১-০.৩
কেঁচো সার	১.০-১.৫	১.৮-২.২	১.০-১.৫

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ১০ ● মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে জীবাণু সারের গুরুত্ব

অধ্যায় সূচি

১০.১ নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু সার

১০.২ ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণু সার

১০.৩ পটাশিয়াম বহনকারী জীবাণু সার

১০.৪ জীবাণু সার ব্যবহারের উপযোগিতা ও সতর্কতা

প্রকৃতিতে কিছু উপকারী জীবাণু আছে যারা বাতাসের নাইট্রোজেনকে শিকড়ের অর্বুদে আবদ্ধ করে গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে অথবা মাটির অদ্রাব্য ফসফেটকে দ্রবীভূত করে গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে তোলে, অর্থাৎ জমির উর্বরতা বাড়ায়। পরীক্ষাগারে বিশেষ উপায়ে এইসব জীবাণু কালচার বা বংশবৃদ্ধি করা হয়। কালচার করা এইসব জীবাণু জমিতে প্রয়োগ করা যায়। প্রতি গ্রাম কালচারের সঙ্গে পাঁক বা কাঠ-কয়লার গুঁড়ো ইত্যাদি ১ ঃ ৩ অনুপাতে মিশিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে প্যাকেট করা হয়। এরকম প্রতিটি প্যাকটের ওজন হয় প্রায় ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম বা ১ কেজি। প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে জীবাণুর নাম, পরিমাণ, কোন কোন ফসলে ব্যবহার করা যাবে, প্রয়োগ পদ্ধতি ও কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে সেই সমস্ত নির্দেশ দেওয়া থাকে।

প্রকৃতিতে বহু সংখ্যক উপকারী জীবাণু পাওয়া গেলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মূলত তৈরি করা হয় রাইজোবিয়াম, অ্যাজেটোব্যাকটার, অ্যাজোস্পাইরিলাম ও ব্যাসিলাস ফার্মাস প্রভৃতি জীবাণুকে।

জীবাণু সার কী

জীবাণু সার হল এক বা একাধিক জীবাণুর মিশ্রণ, যা উপযুক্ত পরিবেশ বা ছায়ায় রেখে কম পরিমাণে ফসলে প্রয়োগ করা হয়। এরা মাটির উর্বরতা শক্তিকে বাড়ায় এবং ফসলে উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখে।

জীবাণু সারের শ্রেণীবিভাগ

জীবাণু সারকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু সার

(খ) ফসফেট/পটাশ দ্রবীভূতকারী জীবাণু সার

(গ) জৈব পদার্থ পচনে সাহায্যকারী জীবাণু সার

(ঘ) পটাশ বহনকারী জীবাণু সার

(ঙ) জিঙ্ক দ্রবণকারী জীবাণু সার

কোন জীবাণু সার কোন ফসলে ব্যবহার করা যাবে

জীবাণু সার	প্রকৃতি	ফসল	একর প্রতি কতটা নাইট্রোজেন ফসফেট জোগায়
১। রাইজোবিয়াম লেগুমিনোসারাম	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	মটর, মুসুর, খেসারি	২০-৩৬ কেজি
২। রাইজোবিয়াম জাপোনিকাম	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	সয়াবিন	৩০-৪০ কেজি
৩। রাইজোবিয়াম প্রজাতি	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	মুগ, ছোলা, কলাই	১৮-৩৬ কেজি
		অড়হর	৪০-৫০ কেজি
৪। অ্যাজেটোব্যাকটার	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	পাট, আলু, আখ, সর্ষে, ভুট্টা, গম তুলো, সূর্যমুখী, ফুল সব ধরনের গ্রীষ্ম ও বর্ষকালীন সবজি	৮-১২ কেজি
৫। অ্যাজোস্পাইরিলাম	নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী	ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, আলু, সর্ষে ও সব ধরনের সবজি।	৮-১২ কেজি
৬। ব্যাসিলাস ফার্মাস	ফসফেট দ্রবণকারী	সমস্তরকম তন্ডুল জাতীয় শস্য, ডালশস্য তৈলবীজ ও সব ধরনের সবজি।	৯-১০ কেজি

১০.১ নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু সার

প্রতি বছর যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সার বিভিন্ন কলকারখানায় উৎপাদন হয় তার প্রায় চারগুণ নাইট্রোজেন বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা মাটিতে আবদ্ধ হয়।

নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু সার দুই প্রকারের। যেমন —

(১) মিথোজীবি নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু।

(২) মুক্তজীবি নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু।

(১) মিথোজীবি নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু রাইজোবিয়াম

রাইজোবিয়াম গোত্রীয় ব্যাকটিরিয়া, শিম্বজাতীয় উদ্ভিদ ছোলা, মুসুর ও সমস্ত ডাল জাতীয় ফসল এবং বাদাম, সয়াবিন প্রভৃতি ফসলের শিকড়ে অর্বুদ তৈরি করে বাস করে। বাতাসের নাইট্রোজেনকে ঐ সমস্ত গাছের শিকড়ে আবদ্ধ করে গাছকে নাইট্রোজেন জোগান দেয়। তার ফলে মাটির উর্বরতা

শক্তি বাড়ে। অনুকূল পরিবেশে রাইজোবিয়াম গোত্রীয় ব্যাকটিরিয়া একর প্রতি ২৫-৩৫ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে যুক্ত করে।

জীবাণুঘটিত ছত্রাকনাশকের সাহায্যে বীজ শোধন করলে জীবাণু সারের উপর তার কুপ্রভাব পড়বে না। এক্ষেত্রে জীবাণুর পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে হবে। প্রথমে ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করার পর বীজের সঙ্গে জীবাণু সার মেশাতে হবে।

অম্লমাটিতে ৪০০ গ্রাম জীবাণু সার ২ কেজি গুঁড়ো চূণ রাইজোবিয়াম মিশ্রিত বীজের সঙ্গে, বীজ ভিজে থাকাকালীন, মিশিয়ে জমিতে বুনলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

বিশেষ প্রজাতির রাইজোবিয়াম বিশেষ ধরনের ডালশস্যের শিকড়ে অর্বুদ তৈরি করে নাইট্রোজেন জমা করতে পারে। বীজ শোধনের আগে সঠিক প্রজাতির জীবাণু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়।

মুক্তজীবি নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু

মাটিতে স্বাধীনভাবে বসবাসকারী বেশ কিছু ব্যাকটিরিয়া বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে মাটিতে আবদ্ধ করতে পারে।

এরমধ্যে অ্যাজোটোব্যাক্টর, অ্যাসিটোব্যাক্টর এবং অ্যাজোস্পাইরিলামের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার ক্ষমতা বেশি থাকায় জীবাণু সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাজোটোব্যাক্টর

অ্যাজোটোব্যাক্টরের প্রজাতিগুলির মধ্যে অ্যাজোটোব্যাক্টর ক্রোকোক্কাম এখানকার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। এরা গাছের শিকড়ের কাছাকাছি বসবাস করে এবং বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে গাছকে সরবরাহ করে। সাধারণত বছরে একর প্রতি ৮-১২ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে জোগান দেয়। অ্যাজোটোব্যাক্টর গাছের বৃদ্ধিবর্ধক পদার্থ, যেমন থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, পাইরিডক্সিন, ইন্ডোল অ্যাসিটিক অ্যাসিড, নিকোটিনিক এবং জিব্রালিন অ্যাসিড প্রস্তুত করে থাকে। এরা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে খুবই উপযোগী হয় এবং গাছকে রোগমুক্ত করতে সাহায্য করে।

অ্যাজোটোব্যাক্টরের কার্যকারিতা নিরপেক্ষ পি.এইচ যুক্ত মাটিতে ভালো হয়। পি.এইচ. ৫.৫ এর নীচে অথবা ৮.৫ এর উপর গেলে কার্যকারিতা লোপ পায়। ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় অ্যাজোটোব্যাক্টর ভালোভাবে কাজ করে। জমিতে জল জমে থাকলে বা তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপর হলে কার্যকারিতা খুবই কমে যায়।

ধান, গম, ভুট্টা, আখ, সবজি, পাট, ডাল এবং তৈলবীজ জাতীয় ফসলে অ্যাজোটোব্যাক্টর প্রয়োগ করা হয়। বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি এবং বায়ু চলাচলে সক্ষম শুকনো মাটিতে অ্যাজোটোব্যাক্টর ব্যবহারের সুফল পাওয়া যায়।

অ্যাজোস্পাইরিলাম

অ্যাজোস্পাইরিলামের তিনটি প্রজাতির মধ্যে অ্যাজোস্পাইরিলাম ব্রাসিলেন্স ও অ্যাজোস্পাইরিলাম লিপোফেরাম প্রকৃতিতে বেশি পাওয়া যায়। এগুলি কৃষিক্ষেত্রে জীবাণু সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরা গাছের শিকড়ের পাশে থাকে এবং বাতাস থেকে নাইট্রোজেন মাটিতে আবদ্ধ করে। অ্যাজোস্পাইরিলাম ভিটামিন ও গাছের বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ তৈরি করে। অধিক পরিমাণ খামারজাত সার মিশ্রিত পি.এইচ. নিরপেক্ষ মাটি অ্যাজোস্পাইরিলামের কার্যকারিতার পক্ষে অনুকূল। তবে অম্ল মাটিতেও অ্যাজোস্পাইরিলাম কাজ করতে পারে। সাধারণত ৩২ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা এর পক্ষে আদর্শ। কিন্তু তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রির নীচে নেমে গেলে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণের কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

সাধারণত এটেল বা এটেল দোআঁশযুক্ত ভারী মাটি, যেখানে বায়ু চলাচল কম হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল থাকলে অ্যাজোস্পাইরিলাম ব্যবহার করা ভালো। ধানের জমিতে অ্যাজোস্পাইরিলাম প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

প্রয়োগ পদ্ধতি

অ্যাজোটোব্যাক্টর এবং অ্যাজোস্পাইরিলাম বিভিন্নভাবে ফসলে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন ঃ

বীজশোধন

প্রতি কেজি বীজের জন্য ১০-২০ গ্রাম জীবাণুসার, ৪০ মিলি ভাতের মাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে লেই প্রস্তুত করা হয়। তারপর, ঐ মিশ্রণে বীজ মাখিয়ে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকিয়ে নিতে হবে।

আলু, আদা, হলুদ প্রভৃতির শোধন

বীজের আয়তন অনুসারে ২০-৫০ লিটার জলে ১ কেজি জীবাণু মেশাতে হবে। তারপর ঐ মিশ্রণে ১ একর জমির বীজ ২৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে লাগাতে হবে।

চারা শোধন

বীজতলায় যে সমস্ত ফসলের চারা তৈরি করে মূল জমিতে লাগাতে হয় তার জন্য চারা তোলার পর বান্ডিল বেঁধে শিকড়গুলো ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া দরকার। এরপর ১ কেজি জীবাণু সার ৫-১৫ লিটার জলে মিশিয়ে এক একর জমির প্রয়োজনীয় চারা ঐ মিশ্রণে ২৫-৩০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে মূল জমিতে বসাতে হবে।

ধানের ক্ষেত্রে ২ বর্গমিটার জায়গায় ১ কেজি জীবাণু সার জমিতে জলের সঙ্গে মিশিয়ে একর প্রতি জমির প্রয়োজনীয় চারা ৮ থেকে ১২ ঘন্টা ঐ মিশ্রণে রাখা দরকার।

জমিতে প্রয়োগ

১ কেজি জীবাণু সার ৫০-১০০ কেজি জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে সেচ দেওয়ার আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

আলু এবং আখে

মাটি দেওয়ার সময় জমিতে প্রয়োগ করা হয়।

ফল এবং বনজ উদ্ভিদে

২৫ গ্রাম জীবাণু সার ৫০০ গ্রাম জৈবসারের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা হয়।

১০.২ ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণু সার

মাটিতে ফসফরাস জটিল রাসায়নিক পদার্থ ফসফেট হিসাবে অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকে যেটা উদ্ভিদ-এর বৃদ্ধিতে কোন সাহায্য আসে না। ঐ জাতীয় ফসফেটকে দ্রবীভূত করার জন্য দু'জাতীয় জীবাণু ব্যবহার হয়। এরা হল ব্যাকটিরিয়া, যেমন ব্যাসিলাস ও সিউডোমোনাস জাতীয়, আর একটি ছত্রাক বংশোদ্ভুত যেমন অ্যাসপারজিলাস ও পেনিসিলিয়াম জাতীয়। এই জীবাণুগুলি মাটিতে যখন বংশ বৃদ্ধি করে সেই সঙ্গে মাটির অম্লত্বও বৃদ্ধি করে, যার ফলে অদ্রবীভূত অবস্থার ফসফেট দ্রবীভূত অবস্থায় পরিণত হয়। মাটিতে ফসফরাসের পরিমাণ বাড়ায় এবং গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

গম ও আলু উৎপাদনে ব্যাসিলাস ও সিউডোমনাস জীবাণুসার মিশ্র ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া যায়। এর ফলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ বেশ কিছুটা কমানো যায়, এবং সেইসঙ্গে পারিপার্শ্বিক দূষণের মাত্রাও কমানো যায়। রাইজোবিয়াম ও ব্যাসিলাম ঘটিত জীবাণু সারেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

১০.৩ পটাশিয়াম বহনকারী জীবাণু সার

গাছের বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ছাড়া পটাশিয়ামেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। মাটিতে পটাশিয়াম অন্যান্য উপাদানের মাধ্যমে যেমন সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা ইত্যাদির সঙ্গে জটিল অবস্থায় থাকে, যার ফলে গাছ সোজাসুজি সেটা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারে না। পটাশিয়াম বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় যেমন মিউরিয়েট অফ পটাশ, পটাশিয়াম সালফেট ও পটাশিয়াম ফসফেট। যৌগ অবস্থায় থাকা পটাশিয়ামকে মুক্ত অবস্থায় আনার জন্য এক জাতীয় জীবাণু ব্যবহার করা হয় যার নাম ফ্রাটুরিয়া-আরেনসিয়া। এই জীবাণুসার ব্যবহারে ভাল ফল দেখা যায়। যেহেতু পটাশিয়াম গাছের বৃদ্ধির জন্য একটা উপাদান, এই জাতীয় জীবাণুসার ধান, গম, নানা জাতীয় শস্য ও তৈলবীজ এবং সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০.৪ জীবাণু সার ব্যবহারে উপকার ও সতর্কতা

ফসলের চাষে জীবাণু সার সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা যায় অথবা বীজ শোধনের সময় বা শিকড়ে প্রয়োগ করা যায়। একটি ফসলের চাষে কম পক্ষে দু'টি পদ্ধতিতে জীবাণু সার প্রয়োগ করলে বেশি ভাল ফল পাওয়া যাবে।

জীবাণু সার ব্যবহারের উপযোগিতা

(১) নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুরা সাধারণত একর প্রতি ৮-১২ কেজি নাইট্রোজেন এবং ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুগুলি একর প্রতি ৮-১০ কেজি ফসফেট উদ্ভিদকে দিতে পারে।

(২) জৈব পদার্থ যোগ করে মাটির গঠন ও উর্বরতা বাড়ায়।

(৩) গাছের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(৪) পরিবেশ দূষণের পরিমাণ কমে, খরচের সাশ্রয় হয়।

(৫) ফসলের ফলন প্রায় ১০-২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(৬) হরমোন, উৎসেচক প্রভৃতি নিঃসরণ করে ফসলের বৃদ্ধি ঘটায়।

এছাড়া ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটিস্ ইত্যাদি জীবাণু মাটির মধ্যে বসবাস করে এবং মাটিতে কোনো জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হলে তার উপর ক্রিয়া শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা জটিল জৈবসারকে সহজ, সরল অজৈব লবণে পরিণত করে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় এনে দেয়। যে সমস্ত ব্যাকটিরিয়া জৈব পদার্থের পচনে সাহায্য করে সেগুলি হল, চেইটোমিয়াম, ট্রাইকোডার্মা, সেফালোস্পোরিয়াম, হিউমিকোলা প্রভৃতি।

জীবাণু সার ব্যবহারের সতর্কতা

(১) জীবাণু সারের সঙ্গে জৈব সার অবশ্যই প্রয়োগ করা দরকার।

(২) জীবাণু সার মেশানোর অন্তত ২৪ ঘন্টা আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে এবং মেশানোর পর আর কোন রোগনাশক বা কীটনাশক মেশানো চলবে না।

(৩) জীবাণু সার প্রয়োগের এক সপ্তাহ আগে অথবা জীবাণু সারের সঙ্গে অন্য কীটনাশক, রোগনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) জীবাণু সারের প্যাকেট কখনোই রোদে রাখা উচিত নয়।

(৫) মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই প্যাকেটের জীবাণু সার ব্যবহার করে ফেলতে হবে।

(৬) নির্দিষ্ট ফসলের জন্য নির্দিষ্ট জীবাণু সার ব্যবহার করতে হবে।

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ১১ ● কম্পোস্ট সার তৈরির পদ্ধতি

অধ্যায় সূচি

১১.১ কম্পোস্ট সার তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি

১১.২ খাদ্যউপাদানে সমৃদ্ধ কম্পোস্ট তৈরি

কম্পোস্ট হল সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এবং সম্পূর্ণরূপে বা ভালোভাবে পচানো জৈবসার। বহু ধরনের পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ বা বর্জ্য পদার্থের মিশ্রণ দিয়ে তৈরি সারকেই কম্পোস্ট বা মিশ্র সার বলা হয়। কম্পোস্ট তৈরি হয় একটি জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেখানে অবাত এবং সবাত শ্বসনকারী জীবাণুগুলি বিভিন্ন রকম জৈব পদার্থের পচন ঘটিয়ে তাদের মধ্যে অবস্থিত কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কমিয়ে দেয় এবং উদ্ভিদের খাদ্যউপাদানগুলিকে গ্রহনযোগ্য করে তোলে। এই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার শেষে যে ভালোভাবে পচানো সার পাওয়া যায়, তাকেই কম্পোস্ট বলে। অন্যান্য সারের তুলনায় এই মিশ্র জৈব সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন ক্ষমতা রক্ষায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এর মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ মাটিতে যোগ হয়। এছাড়া, এতে থাকে উদ্ভিদের উপযোগী ও উপকারী আরো কিছু মুখ্য খাদ্যউপাদান।

কম্পোস্টের মধ্যে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য খাদ্যউপাদানের পরিমাণ নির্ভর করে বর্জ্য পদার্থগুলির উপাদান ও অনুপাতের উপর, যাদের পচিয়ে এই সার তৈরি করা হয়। সবাত জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন তাপ উৎপাদন করে এবং এর থেকে বিক্রিয়ার শেষে মুক্ত জীবাণু পাওয়া যায়। জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন এই তাপ ও মুক্ত জীবাণু কম্পোস্টের প্রত্যাশিত বা আকাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রূপান্তরিত জৈব পদার্থ বা হিউমাস, বা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অত্যাবশ্যক খাদ্যউপাদান, যেমন নাইট্রেট, সালফেট, ফসফেট ইত্যাদি কম্পোস্ট তৈরির সময়ে উৎপন্ন হয়।

কম্পোস্ট সার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত গর্তের বিবরণ

বিভিন্ন রকম পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সার তৈরি করা যায়। মাটির উপরে আবর্জনা স্তূপাকৃত করেও কম্পোস্ট প্রস্তুত করা হয়, আবার মাটিতে গর্ত বা পিট তৈরি করেও এই সার তৈরি করা হয়। পদ্ধতি অনুসারে গর্তের আকার বিভিন্ন হয়। সাধারণত অবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় সার তৈরির জন্য যে গর্ত বা চৌবাচ্চা তৈরি করা হয় তা ৭-৮ ফুট চওড়া (২.১-২.৪ মি.) ও ৩ ফুট গভীর (৯০-১০০ সেমি.) এবং ৩০ ফুট লম্বা (৯ মিটার) হয়। তবে, লম্বা সাধারণত সুবিধা মত দৈর্ঘ্যের হয়। চৌবাচ্চাটি উঁচু এবং সমতল জায়গাতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যেখানে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না। চৌবাচ্চাটি সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে স্থায়ী হবে। চৌবাচ্চাটি মাটির তল থেকে প্রায় ১ ফুট (৩০ সেমি) উঁচুতে হলে ভালো হয়। এতে বৃষ্টির জল ঢুকতে পারবে না। অন্যথায়, পলিথিনের চাদর দিয়ে ঢাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

গর্ত করে কম্পোস্ট সার তৈরির অসুবিধা হল এতে স্থান / জায়গা নির্দিষ্ট বা স্থির হয়ে যায়, পরে সুবিধামত স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। এতে কাজের অসুবিধা হতে পারে। এছাড়া খরচও বেশি হতে পারে।

১১.১ কম্পোস্ট সার তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতি

কম্পোস্ট প্রস্তুত করার সময় খেয়াল রাখা দরকার যেন কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, তাপমাত্রা, বায়ু চলাচল, খাদ্য উপাদানের জোগান (জীবাণুর জন্য), অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মান বা পি.এইচ-এর মান, টুকরো বা দানার আকার ইত্যাদি যেন সঠিক মাত্রায় এবং প্রয়োজন অনুসারে থাকে।

আমাদের দেশে কম্পোস্ট তৈরির দু'টি পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত। এগুলি হল হাওয়ার্ড ইন্দোর পদ্ধতি, যা মূলত সবাত পদ্ধতি এবং আচার্যের ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতি, যেখানে প্রাথমিকভাবে সবাত কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অবাত শ্বসনের মাধ্যমে কম্পোস্ট সার তৈরি করা হয়। এছাড়াও হাচিনসন ও রিচার্ডের অ্যাডকো পদ্ধতি এবং ফাউলারের সক্রিয় কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি ভারতে প্রচলিত আছে। এইসব পদ্ধতি মিলিয়ে মিশিয়ে আমাদের কিছু স্থানীয় বা দেশি পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে।

ইন্দোর পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে গর্ত বা স্তূপ তৈরি করে কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা হয়। এক্ষেত্রে, প্রথমে একটি উঁচু জমি, যার উপরিতল সমান, এমন স্থান বাছাই করে গর্ত খোঁড়া হয়। সাধারণত গর্তটির দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট (৯ মিটার), প্রস্থ ১৪ ফুট (৪.২-৪.৫ মিটার) এবং গভীরতা ৩ ফুট (৯০ সেমি বা প্রায় ১ মিটার) হয়। গর্তের চারধারে পৃষ্ঠটি ঢালু রাখা হয়। এরপর এই বড় গর্তটি দৈর্ঘ বরাবর সমান ৬টি ভাগে ভাগ করে, যে কোনও দিকের প্রথম অংশটি ফাঁকা রেখে দ্বিতীয় অংশ থেকে আবর্জনা দিয়ে ভর্তি করা হয়। (গর্তের উপর ছাউনি থাকলে ভালো হয়।)

গর্তের মধ্যে আবর্জনা ভরাটের পদ্ধতি

(১) প্রথমে গাছপালার বিভিন্ন অংশ, উদ্ভিদ বা ফসলের অবশেষ ইত্যাদি বিছিয়ে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার (৬ ইঞ্চি) পুরু একটি স্তর তৈরি করতে হবে।

(২) এই স্তরের উপরে গোয়ালঘরের আবর্জনা, ফসলের বর্জ্য অংশ, খামারের আগাছা, খড়, খামার সার ইত্যাদি ৫ সেন্টিমিটার (২ ইঞ্চি) পুরু করে ছড়িয়ে দিতে হবে।

(৩) এর উপরে গোমূত্র দ্বারা ভেজা মাটি ও কাঠের ছাই অথবা শুধু মাটি দিয়ে একটি খুব পাতলা স্তর তৈরি করতে হবে।

(৪) এই স্তরের উপরে অল্প করে জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে।

(৫) এইভাবে আগে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত উচ্চতা প্রায় দেড় মিটার (৫ ফুট) না হচ্ছে।

(৬) এরপরে ওই স্তূপের মধ্যে বায়ু চলাচলের জন্য শাবল দিয়ে খাড়াভাবে তিনটি সরু ছিদ্র বা ফুটো করতে হবে, যার ব্যাস প্রায় ১০ সেন্টিমিটার। ইন্দোর পদ্ধতিতে যে গর্তের মধ্যে কম্পোস্ট সার তৈরি করা হয়, তার প্রস্থ হয় প্রায় ১৪ ফুট, অর্থাৎ ৪.২ মিটার। এই ৪.২ মিটার চওড়া গর্তের ঠিক মাঝখানে একটি ছোট সরু ছিদ্র করতে হবে এবং তার থেকে, আর দু'ধারের থেকে, আর দু'ধারের থেকে সমান দূরত্বে, প্রথম ছিদ্রটির দু'পাশে আরও দুটি ছোট সরু ছিদ্র করতে হবে। এইভাবে প্রায় ১ মিটার দূরত্ব রেখে পরপর তিনটি সরু ছিদ্র করতে হবে।

(৭) মূল বড় গর্তটি যা ৬টি ভাগে ভাগ করা হয়, তার ৫টি অংশ আবর্জনা দিয়ে ভর্তি করতে হবে, বাকি একটি অংশ খালি রাখতে হবে, যাতে অন্য গর্তের আবর্জনা উল্টিয়ে রাখা যায়।

(৮) গর্তের আবর্জনাগুলি ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে একবার এবং ৫ সপ্তাহের মাথায় আর একবার উল্টেপাল্টে দিতে হবে।

সাধারণত এই পদ্ধতিতে প্রায় ৮০-১০০ দিনের মধ্যে সারটি ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে।

ইন্দোর পদ্ধতির সুবিধা

(১) গর্তের সমস্ত অংশে দ্রুত পচন শুরু হয়।

(২) মূল গর্তটি ছ'টি সমান অংশে বিভক্ত থাকায় কোন একটি ভাগের বা পার্টিশনের মধ্যে বর্জ্য জৈব পদার্থ দিয়ে ভরাট করার সময় তার উপর দাঁড়াতে হয় না। এর ফলে বেশি চাপ না পড়ায় আঁটসাঁট ভাবটা কম হয়, এতে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয় এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পচন দ্রুত হয়।

(৩) এই পদ্ধতিতে শহরের বর্জ্য পদার্থ এবং মল থেকেও কম্পোস্ট সার প্রস্তুত করা হয়।

(৪) অপেক্ষাকৃত কম সময়ে জৈবসার প্রস্তুত হয়।

ইন্দোর পদ্ধতির অসুবিধা

(১) কম্পোস্ট সারের মধ্যে উপস্থিত উদ্ভিদ খাদ্যউপাদানের নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়।

(২) ইচ্ছে মত স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

(৩) গর্তের উপর ছাউনি না দিলে বৃষ্টির জল ঢুকে অসুবিধা করতে পারে।

মিশ্র জৈবসার বা কম্পোস্ট ঠিকমত তৈরি হয়েছে কিনা জানার উপায়

(১) জৈবসারের রং তামাটে বা কালচে তামাটে বা কালো হয়।

(২) সমস্ত আবর্জনা ভালোভাবে পচে যাবে, তাতে কোনোরকম অপচা, না পচা বা আংশিক পচা দেহাংশ থাকবে না।

(৩) কোনও দুর্গন্ধ থাকবে না।

কম্পোস্ট তৈরির ব্যাপারে যে বিষয়গুলি জেনে রাখা খুবই প্রয়োজন

(১) আবর্জনাতে বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে জীবাণু মিশিয়ে দিলে পচন দ্রুত হয়। গোবর, গোমূত্র, মাটি ও জৈবসারের মধ্যে জীবাণু থাকে। তাই এগুলি উদ্ভিদের দেহাংশের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে পচন তাড়াতাড়ি হয়। আলাদা করে পাওয়া গেলে সরাসরি আবর্জনার সঙ্গে জীবাণু মিশিয়ে দেওয়া ভালো।

(২) সারের গাদায় বায়ু চলাচল যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। গাছের বেশি কচি ও সবুজ দেহাংশ ব্যবহার না করাই ভালো। বায়ু চলাচলের জন্য স্তূপটি মাঝে মাঝে উল্টে-পাল্টে দিতে হবে। বায়ু চলাচল ব্যাহত হলে —

(ক) জৈব সার তৈরি হতে বেশি সময় লাগবে;

(খ) মাটি দুর্গন্ধযুক্ত হবে;

(গ) কিছু অপচা বা আংশিক পচা জৈব দ্রব্য থেকে যাবে, যা বাঞ্ছনীয় নয়।

(৩) মিশ্র জৈবসার প্রস্তুতের ক্ষেত্রে জলের পরিমাণ সঠিক মাত্রায় বজায় রাখা খুবই জরুরি। পচনের শুরুতে জৈব দ্রব্যের মধ্যে প্রায় ৪৫-৫০ শতাংশ জল থাকে, যা পচনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে এবং অবশেষে ৩০-৪০ শতাংশে গিয়ে স্থির হয়। সূক্ষ্ম জৈব পদার্থগুলি, যেমন— তুষ, ভূষি ইত্যাদিতে জল দিলে জমাট বেঁধে যায়। তাই শুধুতে অল্প পরিমাণ জল দিতে হয়। পরে প্রয়োজনমত জলের ছিটা দেওয়া দরকার। জলের পরিমাণ কম হলে জীবাণুর সক্রিয়তা কমে গিয়ে পচন ব্যাহত হয়। আবার, বেশি হয়ে গেলে বায়ু চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পচন ধীরে ধীরে হয়। এর ফলে সার তৈরিতে সময় বেশি লাগে এবং সারটি দুর্গন্ধযুক্ত হয়। (আর্বজনার উপরিতল ঢেকে রাখা দরকার, প্রয়োজনে উপরে ছাউনি দিয়ে নিতে হবে।)

স্তূপে জলের পরিমাণ সঠিক আছে কিনা বোঝায় উপায়

স্তূপের মধ্যে এক আঁটি শুকনো খড় ৫-৬ মিনিট ঢুকিয়ে রাখার পর যদি আঁটিটি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়, তবে ধরে নিতে হবে স্তূপে সঠিক পরিমাণে জল আছে। অন্যদিকে আঁটি বেশি ভেজা হলে বুঝতে হবে বেশি জল আছে। আবার আঁটি একেবারে শুকনো হলে জল কম আছে ধরে নিতে হবে।

বাঙ্গালোর পদ্ধতি

আমাদের দেশের লোকসংখ্যা এখন একশো কুড়ি কোটিরও বেশি। এই বিশাল জনসংখ্যা থেকে উদ্ভূত মানুষের মল, মূত্র, কলকারখানার আবর্জনা, রাস্তার ময়লা, নর্দমার জঞ্জাল, কাঠের ছাই ইত্যাদিকে ব্যবহার করে ব্যাঙ্গালোর পদ্ধতির মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের কম্পোস্ট বা মিশ্র জৈব সার তৈরি করা যায়। সাধারণত এই পদ্ধতিতে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে শহরের আবর্জনা ও ময়লা ফেলে সার তৈরি করা হয়।

এই সার তৈরির জন্য শহর থেকে অন্তত এক মাইল দূরের কোনও স্থান (পশ্চিম দিকের অংশ ছাড়া যে কোনোদিকে) সুবিধামত আকারের গর্ত খুঁড়ে কম্পোস্ট সার তৈরি করতে হবে।

এই পদ্ধতিতে সার তৈরির সময়েও একটি উঁচু কিন্তু উপরিতল সমান এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। এই রকম জায়গায় একটি বড় গর্ত খুঁড়তে হবে যার প্রস্থ ১.৮-২.৪ মিটার (৬-৮ ফুট), গভীরতা ৯০-১০০ সেন্টিমিটার (৩ ফুট) এবং দৈর্ঘ্য হবে নিজের সুবিধামত। তবে দৈর্ঘ্য ৯ মিটার (৩০ ফুট) -এর বেশি না হওয়াই ভালো। গর্তের মেঝেতে ঢাল রাখা দরকার এবং মেঝেটি পাকা হলে ভালো হয়।

গর্ত ভর্তি করার পদ্ধতি

(১) প্রথমে গর্তটিকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এর জন্য একটি সরানো যায় এমন বিভাজক বা দেওয়াল বা পার্টিশন এর প্রয়োজন।

(২) বড় গর্তের একদিকে যেখানে গভীরতা একটু কম, সেদিকে দেওয়াল থেকে ৬০-১২০ সেন্টিমিটার (২.৪ ফুট) দূরত্বে বিভাজক দেওয়ালটি বসাতে হবে। এর ফলে যে ছোট গর্তটি তৈরি হবে তার আকার হবে প্রায় (৬০-১২০ সেন্টিমিটার) x (১.৮-২.৪ মিটার) x ৯০-১০০ সেন্টিমিটার [(২-৪ ফুট) x (৬-৮ ফুট) x ৩ ফুট]।

(৩) বিভিন্ন রকম আবর্জনা সংগ্রহ করে তা ভালোভাবে মেশানোর পর মিশ্রণটি প্রথমে এই ছোট গর্তে সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে উপরে অল্প জলের ছিটে দিতে হবে। যে পরিমাণ শুকনো আবর্জনা ছড়ানো হয় ঠিক সেই পরিমাণ বা তার দেড় গুণ জল ছেটাতে বা মেশাতে হবে। এভাবে একটি স্তূপ তৈরি হবে। এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তির ফলে স্তূপের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে মাটি থেকে ৩০-৬০ সেন্টিমিটার (১-২ ফুট) উপর পর্যন্ত পৌঁছলে কাঁচামালের মিশ্রণ দিয়ে গর্ত ভরাট করা বা স্তূপাকার করা, বন্ধ করে দিতে হবে। এই পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য সাধারণত ৭-৮ দিন সময় লাগে।

(৪) ছোট স্তূপটির উপরকার অংশ বা মাথাকে এবার গম্বুজের মতো গোলাকৃতি তৈরি করতে হবে যাতে জল পড়লে সহজে গড়িয়ে পড়ে। তারপর মাটি কাদা দিয়ে লেপে দিতে হবে। (প্রায় ২.৫

সেন্টিমিটার (১ ইঞ্চি) পুরু করে মাটি দিয়ে একই পদ্ধতিতে পরের গর্তগুলিও ভরাট করতে হবে)।

(৫) এইভাবে প্রথম গর্তটি ভর্তি হয়ে গেলে একই পদ্ধতিতে পরের গর্তগুলিও ভরাট করতে হবে।

(৬) কাদা দিয়ে লেপে দেওয়ার পর স্তূপটি আর ওল্টানো যাবে না এবং জলের ছিটেও দেওয়া চলবে না।

(৭) প্রায় ১৫০-২৫০ দিনের মধ্যে মিশ্র জৈব সার তৈরি হয়ে যাবে অর্থাৎ এরপর তা ব্যবহার করা যাবে।

বাঙ্গালোর পদ্ধতির সুবিধা

(১) এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত মিশ্র জৈবসারে দুর্গন্ধ থাকে না।

(২) রোগ-জীবাণুগুলিকে সহজেই দমন করা যায়, ফলে এই সার স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত।

(৩) উচ্চ তাপমাত্রায় মাছি শূক বা লার্ভা মরে যাওয়ায় মাছির উপদ্রব কম হয়।

(৪) অনেক আগাছার বীজও উচ্চ উষ্ণতায় বিনষ্ট হয়।

(৫) নাইট্রোজেনের ও জৈব পদার্থের অবলুপ্তি কম হয়। ফলে, উৎপন্ন সারের মান ভালো হয় এবং এতে উদ্ভিদ খাদ্যউপাদানের পরিমাণ বেশি থাকে।

(৬) একবার কাদা দিয়ে লেপে দেওয়ার পরে আর ওল্টাতে বা জলের ছিটা দিতে হয় না বলে পরবর্তীকালে দেখভাল কম করতে হয়। এতে পরোক্ষভাবে মজুরি বাবদ খরচও কম হয়।

বাঙ্গালোর পদ্ধতি অসুবিধা

(১) এই পদ্ধতিতে কম্পোস্ট বা মিশ্র জৈবসার তৈরি করতে অনেক বেশি সময় লাগে।

(২) স্থান পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না।

(৩) গর্তের উপর ছাউনি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এতে খরচ বাড়ে।

কোয়েম্বাটুর পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে খামারের বর্জ্য পদার্থ, গোবর জল ও হাড়ের গুঁড়ো পরপর রেখে স্তূপ তৈরি করা হয়। মাটির নীচে চৌবাচ্চা করে স্তূপ করা যায়। মাটির উপরের অংশকে কাদা দিয়ে লেপে দেওয়া হয়।

এই রকম বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে মিশ্র জৈবসার তৈরি করা যায়। এছাড়াও চাষিরা কিছু সহজ বা স্থানীয় পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি করে থাকেন, যেমন – (১) ড্রাম পদ্ধতি, (২) চৌদ্দ দিনের পদ্ধতি ইত্যাদি।

সক্রিয় পদ্ধতি বা অ্যাকটিভেটেড মেথড

ফাউলার ও রেজ এই পদ্ধতির আবিষ্কারক। তাঁরা গোবর সার, সিউয়েজ অর্থাৎ ড্রেন বা নর্দমার আবর্জনা, স্লাজ বা পাঁক ইত্যাদিকে প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করেন।

অ্যাডকো পদ্ধতি

অ্যাডকো হল ইংল্যান্ডের একটি প্রাইভেট কোম্পানি যার পুরো নাম এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি। এরা মিশ্র জৈবসার প্রস্তুতের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তাকে অ্যাডকো পদ্ধতি বলে। এই পদ্ধতিতে অ্যাডকো পাউডারকে প্রভাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে খামারের বিভিন্ন আগাছা ও আবর্জনার স্তূপের উচ্চতা ১.৮ মিটার (৬ ফুট)-এর বেশি রাখা হয় না। প্রতি ৪৫.৪ কেজি (১০০ পাউন্ড) শুষ্ক পদার্থের জন্য অ্যাডকো পাউডার লাগে ৩.২ কেজি (৭ পাউন্ড) (প্রায় ১৪ঃ১ অনুপাতে আবর্জনা ও পাউডার ব্যবহার করা হয়।)

নভকম কম্পোস্ট

নভকম কম্পোস্ট গুণমানে উন্নত এবং বৈজ্ঞানিক জৈব চাষ পদ্ধতির এক প্রধান উপাদান। এই কম্পোস্ট প্রকৃতিজাত শক্তির আধার। এই জৈব সার মাটি ও উদ্ভিদের প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই কম্পোস্ট খুব দ্রুত তৈরি হয়, গুণমানের উন্নত এবং মাটির উর্বরতা এবং উৎপাদিকা শক্তি ফিরিয়ে আনার এক আদর্শ জৈব আধার।

একটি আদর্শ বা ভাল কম্পোস্ট সারের যে পাঁচটি গুণ বা ধর্ম থাকা দরকার ঃ

(১) মাটিতে ব্যবহার করা পর কার্যকর হবে;

(২) সস্তা এবং সহজলভ্য দ্রব্য দিয়ে তৈরি করা যাবে;

(৩) দ্রুত তৈরি করা যাবে;

(৪) পরিবেশ এবং ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে নিরাপদ হবে;

(৫) আর্থিকভাবে সাশ্রয়কর বা সস্তা হবে।

এইসব গুণ নভকম কম্পোস্টে আছে। তাই নভকম কম্পোস্ট একটি আদর্শ কম্পোস্ট। এই কম্পোস্ট তৈরি করার জন্য যে কোনও জৈব পদার্থ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই

জৈবসারে প্রচুর পরিমাণে উপকারী অণুজীবি উপস্থিত থাকে। এই অণুজীবিরা মাটির সাথে মিশে গিয়ে মাটিতে উপস্থিত উদ্ভিদের খাদ্যউপাদানগুলিকে ফসলের গ্রহণযোগ্য করে তোলে, মাটিকে উর্বর করে তোলে, ফসল উৎপাদনের আদর্শ পরিবেশ গড়ে তোলে। এই কম্পোস্ট তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ লাগে। এই কম্পোস্টে পটাশের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি থাকে। কঠিন পরিবেশে (স্ট্রেস কন্ডিশন) বা অনুর্বর জমিতে এই জৈবসার ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। কার্যকারিতা, স্বকীয় গুণ বা উন্নতমান এবং সহজ পদ্ধতিতে তৈরি হওয়া নভকম কম্পোস্টের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যা এই জৈবসারকে করে তুলেছে অনন্য। এই সার ব্যবহার করার ফলে মাটির উপযুক্ত পরিবেশ খুব তাড়াতাড়ি এবং সাফল্যের সাথে ফিরে আসে।

নভকম সারের সাথে কেঁচো সার ও অন্যান্য কম্পোস্ট সারের তুলনামূলক চিত্র নীচে দেওয়া হল।

খাদ্যউপাদান	নভকম জৈবসার	কেঁচো সার	সাধারণ কম্পোস্ট সার
কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত	১৮ ঃ ১	১৭ ঃ ১	১২ ঃ ১
মোট নাইট্রোজেন (%)	১.৭৩	১.৮০	১.৫০
মোট ফসফেট (%)	১.২১	১.৩২	০.৩২
মোট পটাশ (%)	১.৫০	১.৩০	০.৬৮
প্রতি গ্রাম ভেজা সারে অণুজীবীর সংখ্যা	২-১৮ x $১০^{১৭}$	১-৩ x $১০^{৯}$	১-৩ x $১০^{৯}$

নভকম কম্পোস্ট তৈরি করার পদ্ধতি

প্রয়োজন কাঁচামাল বা উপাদান

গোবর ও বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ, বিশেষ করে সবুজ গাছপালা এই কম্পোস্ট তৈরির প্রধান উপাদান। শতকরা ৮০ ভাগ জৈব পদার্থের সাথে শতকরা ২০ ভাগ কাঁচা গোবর মিশিয়ে এই জৈবসার তৈরি করা হয়। এক টন নভকম কম্পোস্ট তৈরি করার জন্য প্রায় ১৬০০ কেজি সবুজ জৈব পদার্থ এবং ৪০০ কেজি কাচা গোবর লাগে। এই সার তৈরি হওয়ার সময় সৌরশক্তি এর মধ্যে সঞ্চিত হয় এবং এই সৌরশক্তি গাদার ভেতরকার উষ্ণতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া অণুজীবীরাও উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। প্রায় ৬০-৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় অপকারী জীবাণু, আগাছার বীজ নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে কিছু তাপপ্রিয় উপকারী জীবের/অণুজীবির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরা জৈব পদার্থগুলিতে পচিয়ে দ্রুত কম্পোস্ট তৈরি করে।

নভকম কম্পোস্ট তৈরি করার সময় তিনবার নভকম দ্রবণ প্রয়োগ করা হয়। এই দ্রবণ বিভিন্ন রকম গাছপালা থেকে তৈরি করা হয়। প্রথম দিন প্রয়োজনমতো জৈব পদার্থ, যথা — সবুজ গাছ,

আগাছা ইত্যাদি সংগ্রহ করে তা কুচি কুচি করে কেটে একটি পরিষ্কার জায়গায় বিছিয়ে প্রায় ১ ফুট পর্যন্ত উঁচু করতে হবে। এর উপর প্রতি লিটার জলে ৫ মিলি হারে নভকম দ্রবণ গুলে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। এরপর এর উপর ৩-৫ ইঞ্চি কাঁচা গোবর ছড়াতে হবে। পুনরায় ১ ফুট উঁচু করে জৈব পদার্থ বিছিয়ে তার উপর নভকম দ্রবণ স্প্রে করতে হবে। এর উপর আবার ৩-৫ ইঞ্চি পুরু করে গোবর ছড়াতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে জৈব পদার্থ ও কাঁচা গোবর রেখে গাদার উচ্চতা ৬ ফুটের মতো করতে হবে। সবচেয়ে উপরের স্তরে জৈব পদার্থ থাকতে হবে। গাদার উচ্চতা কম হলে নভকম কম্পোস্টের মান খারাপ হবে। গাদার উচ্চতার উপর গাদার অভ্যন্তরের চাপ ও উষ্ণতা নির্ভর করে। উষ্ণতা কম হলে কম্পোস্টের গুণমান খারাপ হলে কম্পোস্ট তৈরি হওয়ার সময় বেড়ে যাবে। ভালোভাবে স্প্রে করতে প্রতি টন জৈব পদার্থের জন্য ৯০ মিলি নভকম দ্রবণ ও ১৮ লিটার জল লাগবে। গোবরের পরিমাণ কিছুটা কম-বেশি হতে পারে, কিন্তু গোবরের পরিমাণ খুব কম বা শূন্য হলে চলবে না। গোবর সৌরশক্তির শোষক ও ধারক হিসেবে কাজ করে এবং অণুজীবির বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

প্রথমবার গাদা তৈরি করার পর এইভাবে ৭ দিন রেখে দিতে হবে। এই ৭ দিনে গাদার আয়তন এবং উচ্চতা কমে যাবে অষ্টম দিনে গাদা ভেঙে জৈব পদাথগুলিকে উল্টে পাল্টে ভালোভাবে মিশিয়ে নীচের অংশ উপরে তুলে, উপরের অংশ নীচে রেখে পুনরায় গাদা তৈরি করতে হবে এবং একই হারে (৫ মিলি/লিটার) নভকম দ্রবণ স্প্রে করতে হবে। এই সময়ে গাদার আয়তন প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রেও গাদার উচ্চতা কম করে ৫$^{১}/_{২}$-৬ ফুট রাখতে হবে। পাশাপাশি দুটি গাদাকে মিশিয়ে একটি গাদা তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু গাদার উচ্চতা ৫$^{১}/_{২}$-৬ ফুট রাখার কথা মাথায় রাখতে হবে।

এই সময় অষ্টম দিনে প্রতি টন জৈব পদার্থের জন্য ৭৫ মিলি নভকম দ্রবণ এবং ১৫ লিটার জল লাগবে। এইভাবে আবার ৭ দিন রেখে দিতে হবে। পনেরো দিনের গাদা ভেঙে পুনরায় অষ্টম দিনের পদ্ধতি অনুসরণ করে গাদা সাজাতে হবে। এক্ষেত্রেও গাদার উচ্চতা ৫$^{১}/_{২}$-৬ ফুট রাখতে হবে। গাদা তৈরির সময় নভকম দ্রবণ (প্রতি লিটার জলে ৫ মিলি হারে) স্প্রে করতে হবে। এই সময় গাদার আয়তন আরও কমে যাবে, তাই দু'তিনটি গাদা ভেঙে একটি গাদা তৈরি করা যেতে পারে।

একুশ দিনের মাথায় কম্পোস্ট সার তৈরি হয়ে যাবে এবং তা জমিতে প্রয়োগ করা যাবে।

নভকম কম্পোস্টের গুণমান বা তৈরির সময় নির্ভর করে কাঁচামালা বা মূল জৈব পদার্থের উপর। পরিবেশের প্রভাবও থাকে। জৈব পদার্থের গাদায় যাতে খুব রোদ পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রয়োজনে, গাদার উপরিভাগ শুকিয়ে গেলে খুব হালকাভাবে জল দিয়ে গাদা ভিজিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বৃষ্টির জল গাদার পক্ষে খারাপ। বৃষ্টির জল থেকে গাদাকে বাঁচানোর জন্য স্বচ্ছ পলিথিনের চাদর দিয়ে গাদার উপর আচ্ছাদন দিয়ে দেওয়া ভাল।

নভকম কম্পোস্টের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক উপকারী অণুজীবি থাকে। এদের উপস্থিতিতে এই জৈবসারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। প্রতি কেজি নভকম কম্পোস্ট তৈরি করতে মাত্র ১ টাকা খরচ হয়। জৈব খামারে এই খরচ আরো কম হয়।

চৌদ্দ দিনে জৈবসার তৈরির পদ্ধতি

কম্পোস্ট তৈরির এই পদ্ধতিতে বর্জ্য জৈব পদার্থগুলিকে খুব ছোট ছোট টুকরো করে তার সঙ্গে গোবর মিশিয়ে এক মিশ্রণ তৈরি করা হয়, যার অনুপাত হয় ১ ঃ ২ থেকে ১ ঃ ৩ (অর্থাৎ এক ভাগ গোবরের সঙ্গে দু'ভাগ জৈব পদার্থ বা তিন ভাগ জৈব পদার্থ)। এরপর এই মিশ্রণ দিয়ে ১২০ সেন্টিমিটার x ১২০ সেন্টিমিটার x ১২০ সেন্টিমিটার (৪ ফুট x ৪ ফুট x ৪ ফুট) আয়তনের একটি স্তূপ সাজানো হয়। স্তূপটির উপরে কলাপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। দু-একদিন পরে মিশ্রণের ভিতরের অংশ গরম হয়ে উঠলে তাকে খুব ভালোভাবে উলোটপাল্টে মিশিয়ে দেওয়া হয়, যাতে স্তূপের ভেতরের অংশ বাইরে চলে আসে এবং বাইরের অংশ ভিতরে চলে যায়। এরকম ভাবে দু'দিন অন্তর অন্তর স্তূপাকার মিশ্রণকে ভালোভাবে উল্টেপাল্টে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে প্রায় ১৪ দিনের মধ্যে কম্পোস্ট সার তৈরি হয়।

এই পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে বেশি গোবর লাগে এবং ঘন ঘন উল্টেপাল্টে দেওয়ার জন্য শ্রমও বেশি হয়। মিশ্রণের ভিতরের অংশ সর্বদা আর্দ্র থাকা দরকার (ভেজা নয়)। এর জন্য মাঝে মাঝে জল ছেটাতে হয়। কোন কারণে যদি মিশ্রণটি ভেজা থাকে, তবে ছাই বা আরও কিছু শুকনো জৈব পদার্থ এর সঙ্গে মেশাতে হবে। মিশ্রণ ভেজা থাকলে তা থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। এই দুর্গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত দু-দিনের পরিবর্তে প্রতি একদিন অন্তর মিশ্রণটিকে উল্টেপাল্টে দিতে হয়।

ড্রাম পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরি

একটি বড় ড্রামের গায়ে ১৫-২০ সেন্টিমিটার অন্তর কিছু ফুটো করা হয় এবং তলার দিকে কিছুটা বড় আকারের ছিদ্র করা হয়। নীচের তলার এই ছিদ্রটিকে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এরপর এই ড্রামের মধ্যে ঘাস, পাতা ইত্যাদি টুকরো টুকরো করে ভরে দেওয়া হয়। এছাড়াও গোবর, মাটি ও জল দেওয়া হয়। ড্রামটিকে ঘরের উঠোনে অথবা সুবিধামতো কোনও জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে ঘাস, পাতা, গোবর, মাটি এবং জলের অনুপাত থাকে ৩ ঃ ৩ ঃ ১ ঃ ১। ড্রাম পদ্ধতিতে তাড়াতাড়ি কম্পোস্ট তৈরি করা যায়। প্রায় ৭০-৮০ দিনের মধ্যে এই কম্পোস্ট সার তৈরি হয়। এছাড়া, এই পদ্ধতির সুবিধা হল সার তৈরি হওয়ার পর ড্রামের তলার ছিদ্রের ঢাকনা সরিয়ে রোজই প্রয়োজনমতো কম্পোস্ট সার বের করে নেওয়া যায়। আবার উপরের খোলা মুখ দিয়ে নিয়মিত কম্পোস্ট সার তৈরির উপাদান যোগ করা যায়।

ঠিকমতো অক্সিজেন বা বাতাসের চলাচল বজায় রাখার জন্য ড্রামের গায়ে ফুটো করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত বর্জ্য পদার্থগুলি যথাসম্ভব টুকরো টুকরো করে দেওয়া উচিত। মাঝে মধ্যে এগুলি উল্টেপাল্টে দিলে ভালো হয়।

গোবর ছাড়া কম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি

কম্পোস্ট তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে গোবর পাওয়া না গেলে একটি উঁচু সমতল (জল যাতে না দাঁড়াতে পারে) জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে প্রায় ৪.৫-৬ মি. x ১.৫-১.৮ মি. x ০.৯-১.৮ মি.

আয়তন বিশিষ্ট গর্ত খুঁড়তে হবে। বিভিন্ন রকমের আগাছা, গাছের দেহাবশেষ, আখের ছিবড়ে ইত্যাদি ভালো করে মিশিয়ে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার (১ ফুট) উঁচু একটি স্তর তৈরি করতে হবে। এর উপরে গোবর জলের মিশ্রণ অথবা মাটি জলের মিশ্রণ সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর একইরকম ভাবে পরপর কয়েকটি স্তর তৈরি করার পর যখন সম্পূর্ণ স্তূপটি ভূমি বা মাটির উপরিভাগ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার (২ ফুট) পর্যন্ত উঁচু হয়ে যাবে, তখন জল ও কাদার পাতলা স্তর দিয়ে স্তূপটির উপরকার অংশ (মাথা) লেপে দিতে হবে। প্রায় ৯০ দিন পরে গর্তের ভিতরের সমস্ত দ্রব্য বের করে মাটির উপরে গম্বুজের মতো স্তূপ করে রাখতে হবে। জল দিয়ে স্তূপটিকে সামান্য ভেজাতে হবে এবং তারপর জলকাদার প্রলেপ দিয়ে ঢাকতে হবে। প্রায় ১-২ মাস (৩০-৬০ দিন) এর মধ্যে অর্থাৎ মোট ১২০-১৫০ দিন পরে কম্পোস্ট তৈরি হবে। এইভাবে তৈরি মিশ্র জৈব সারে প্রায় ০.৫ ঃ ০.১৫ ঃ ০৫ অনুপাতে নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ থাকে।

এই পদ্ধতিতে ওল্টানো পাল্টানোর কোনো ব্যাপার না থাকায় এবং ঘন ঘন জলের ছিটে দেওয়ার প্রয়োজন না থাকায়, পরোক্ষভাবে মজুরি বাবদ খরচ কম হয়। তবে অসুবিধা হল এই পদ্ধতিতে সার তৈরি হতে অনেক বেশি সময় লাগে।

(গর্ত করে কম্পোস্ট সার তৈরির ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হল স্থির বা নির্দিষ্ট জায়গায় সারটি তৈরি হয়। এতে আবর্জনা দিয়ে গর্ত ভর্তি করার সময় এবং পরবর্তীকালে তৈরি সার জমিতে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় বহন বাবদ ও শ্রমিকের মজুরি বাবদ খরচ বেশি পড়ে।)

১১.২ খাদ্যউপাদানে সমৃদ্ধ কম্পোস্ট তৈরি

কম্পোস্ট সারকে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানে সমৃদ্ধ করার জন্য সঠিক বা উপযুক্ত জৈব পদার্থ বাছাই করে কম্পোস্ট তৈরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(১) কিছু কিছু জৈব পদার্থ খুব তাড়াতাড়ি পচে যায়, যেমন সতেজ কচি পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি। তেমনি আবার কিছু কিছু পদার্থ যেমন খড়, শুকনো কান্ড, কাঠের গুঁড়ো ইত্যাদি পচাতে অনেক বেশি সময় লাগে। মিশ্র জৈবসার তৈরির সময় এই দুই প্রকার পদার্থই ব্যবহার করা ভালো।

(২) একইরকম জৈব পদার্থ থেকে সার তৈরি না করে বিভিন্ন রকম জৈব পদার্থের মিশ্রণ থেকে তৈরি করলে সারের মান ভালো হয়। (যেমন গোবর, গোমূত্র, কচুরিপানা, খড়, গাছের শক্ত ও নরম কান্ড, ছাল বা বাকল, লতাপাতা ইত্যাদি)।

(৩) যেসব জিনিস সহজে পচে না বা একেবারেই পচনযোগ্য নয়, যেমন কাঁচ, পাথর, ইট, পোরসেলিন/চীনামাটির বাসন (কাপ, প্লেট ইত্যাদি), বোতল, প্লাস্টিকের টুকরো, ছেঁড়া কাপড়, পলিথিনের ব্যাগ প্রভৃতি বাদ দিতে হবে।

(৪) অবাঞ্ছিত উপদ্রব এড়াতে মাছ, মাংস ইত্যাদি জাতীয় জিনিস ব্যবহার না করাই ভালো।

(৫) ভাইরাস ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত গাছের অংশ অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

কম্পোস্ট সার ঠিকমতো তৈরি না হলে গাছের খাদ্যউপাদানে সমৃদ্ধ হয় না। সঠিক পদ্ধতিতে কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে পরিবেশের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, তাপমাত্রা, জল, অক্সিজেন, বৃষ্টিপাত, অম্লত্ব-ক্ষারত্ব, আবর্জনার সহজলভ্যতা ও তার ঘনত্ব, আবর্জনার মিশ্রণ ও স্তূপের উচ্চতা ইত্যাদি ঠিকঠাক হতে হবে।

কম্পোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে তাপমাত্রার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যে জীবাণুগুলি আবর্জনার জৈব পদার্থ পচানোর কাজ করে, সেগুলি কেবল সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রার বিস্তার বা সীমার মধ্যে সক্রিয় বা জীবিত থাকে। তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমার বেশি বা কম হলেই জীবাণুগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সাধারণত, পচনের সময় তাপমাত্রা ৫০-৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস কখনো কখনো ৭০ ডিগ্রি পর্যন্ত উঠে যায়।

জৈব পদার্থ পচনের কাজে অংশগ্রহনকারী জীবাণুগুলির কার্যকারিতা নির্ভর করে কম্পোস্ট পিটে সঠিক পরিমাণে জল থাকার ওপর। জলের যে সর্বোচ্চ পরিমাণ উপস্থিতি অক্সিজেনের চলাচল ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে না, সেই পরিমাণ জল থাকা দরকার।

কম্পোস্ট পিটে তাপ উৎপাদন ও বিভিন্ন রকমের তাপ নিয়ন্ত্রণ বিক্রিয়া অক্সিজেনের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেখা গেছে, অক্সিজেন ছাড়া পিটে তাপ উৎপাদন প্রায় একশো ভাগ কমে যায়। বাতাস ও বাতাসের অক্সিজেন ছাড়া কম্পোস্ট পিটে সার তৈরির সময় উৎপন্ন জৈব অম্ল, উদ্বায়ী সালফার ও নাইট্রোজেনের যৌগ এবং অন্যান্য বস্তু দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে।

বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যদি কম্পোস্ট পিট বা স্তূপের ছাদ গোলাকার হয়, তাহলে বৃষ্টিপাতের ফলে বিশেষ কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষেত্রে যদি অল্প বৃষ্টির ফোঁটা স্তূপের ভিতরে যায়, তাহলে পরবর্তীকালে স্তূপের মধ্যে পচনশীল আবর্জনাগুলি ওলোটপালোট করার মধ্য দিয়ে সেই ক্ষতির প্রভাব কিছুটা কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু বৃষ্টিপাত সমস্যার সৃষ্টি করে যখন গর্ত অথবা বিনের মধ্যে কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। গর্তের মধ্যে রাখা আবর্জনা স্তূপের মাথা গোলাকার করে তৈরি করলে গর্তের সীমানা বা চারধার কংক্রীটের বানালে বৃষ্টিপাতের সমস্যা অনেকটাই এড়ানো যায়।

কম্পোস্ট সার তৈরির সময় এই সারের গুণাগুণ অনেকাংশে নির্ভরশীল স্তূপের পচনশীল আবর্জনার অম্লত্ব-ক্ষারত্ব মানের ওপর। স্তূপে বাতাস ও বাতাসের অক্সিজেনের অভাবে জৈব অ্যাসিড তৈরি হলে, তা জমিতে প্রয়োগের পর ফসলের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। কম্পোস্ট স্তূপে অম্লত্ব কমানোর জন্য আবর্জনার সঙ্গে মাটি বা চূণ মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

কম্পোস্ট স্তূপের মধ্যে আবর্জনার পচন কতটা হবে তা নির্ভর করে কী কী আবর্জনা ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার পরিমাণ বা ঘনত্বের উপর। স্তূপে ঢালা আবর্জনার মধ্যে কাঠের গুঁড়ো, খড়, গাছের

ছাল ইত্যাদি স্তূপের আয়তন বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করলে স্তূপের মধ্যে বাতাস চলাচলের ছিদ্র বাড়ে। ফলে, জীবাণুগুলি পচনক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। স্তূপের উচ্চতা দুই মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে, স্তূপের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পচনক্রিয়ায় সহযোগী জীবাণুগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ করে।

গাছের খাদ্যউপাদানে সমৃদ্ধ কম্পোস্ট তৈরি করতে হলে ঘাসপাতা, রান্নাঘরের পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ, সবজির খোসা, ফলের খোসা, খাবারের উচ্ছিষ্ট, পশুপাখির মল, গোবর, গোমূত্র, কাঠের গুঁড়ো, খইল, প্রাণীর দেহের অংশ ইত্যাদি আবর্জনা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। পলিথিনের ব্যাগ, প্লাস্টিক, রবার, কাঁচের জিনিসপত্র, কাপড় জামা স্তূপে আবর্জনা হিসাবে কখনই ঢালা উচিত নয়।

কম্পোস্ট সার তৈরির জন্য যে স্তূপ তৈরি করা হয়, তার উচ্চতা যদি খুব কম হয়, তাহলে উৎপন্ন তাপ খুব তাড়াতাড়ি হ্রাস পায়। ফলে আবর্জনা স্তূপের মধ্যে অবস্থিত ক্ষতিকর রোগ-জীবাণুর বিনাশ বা আবর্জনার পচনের জন্য উপকারী জীবাণুগুলির পক্ষে উপযুক্ত তাপমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এছাড়াও জলীয় বাষ্প দ্রুত কমে যাওয়ার ফলে পচনক্রিয়া বিলম্বিত হবে। সাধারণত, যে কোনও আবর্জনা স্তূপের সর্বাধিক উচ্চতা ১.৫-১.৮ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। শীতকালে স্তূপের উচ্চতা বাড়ানো যেতে পারে, গরমকালের তুলনায়। কম্পোস্ট তৈরির সময় স্তূপে জীবাণুর সক্রিয়তা কমে গেলে তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে নামতে থাকে। এই সময় স্তূপটি উল্টেপাল্টে দিলে স্তূপের মধ্যে বাতাস চলাচলের উন্নতি ঘটে এবং অক্সিজেনের আদানপ্রদান বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জীবাণুর সক্রিয়তা পুনরায় বেড়ে যায় এবং পচনও চলতে থাকে। স্তূপটি এরকমভাবে কয়েকবার উল্টেপাল্টে দিলে কম্পোস্ট সার তৈরিতে সময় কম লাগে এবং সারের মান ও খাদ্যউপাদান উপস্থিতির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, উন্নতমানের কম্পোস্ট সার তৈরি করতে টাটকা আবর্জনার সঙ্গে রকফসফেট, হাড়গুঁড়ো, ছাই, আগে তৈরি কম্পোস্ট মেশানো হয়ে থাকে। এই পদার্থগুলি পচনক্রিয়ায় সাহায্যকারী জীবাণুগুলিকে পুষ্টি জোগায়। এতে জীবাণুর পচানোর ক্ষমতা বেড়ে যায়।

কম্পোস্ট সার তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যে বিভিন্ন উপায়ে ও বহু কারণে গাছের বেশি প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানগুলি কম্পোস্ট তৈরি বা প্রক্রিয়া চলাকালীন বিলুপ্ত হয় বা পরিমাণে হ্রাস পায়। যেমন, গোয়াল ঘরের মেঝে কাঁচা থাকলে গোমূত্র ওই মেঝেতে শোষিত হয়। এই গোমূত্রে প্রচুর ইউরিয়া থাকে এবং মেঝেতে শোষিত হওয়ার ফলে তা কম্পোস্টের মাধ্যমে গাছের কাছে আর পৌঁছয় না। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে, মাঝে মাঝে কোদাল দিয়ে গোয়াল ঘরের মেঝে খুঁড়ে মেঝের মাটি কম্পোস্ট স্তূপে আবর্জনার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটির মেঝের ওপর আলগা বালি বা মাটি ছড়িয়ে দিলে ওই বালি বা মাটি গোমূত্র শোষণ করে নেবে। পরে ওই বালি বা মাটি চেঁছে তুলে নিয়ে কম্পোস্ট স্তূপে দিলে কম্পোস্টে গাছের খাদ্যউপাদানের পরিমাণ বাড়বে। সবচেয়ে ভাল, গোয়াল ঘরের মেঝে পাকা করে গোমূত্র নিকাশি নালা দিয়ে গোমূত্র নালার শেষপ্রান্তে একটা চৌবাচ্চায় সংগ্রহ করে কম্পোস্ট তৈরির স্তূপে ঢালা যেতে পারে। গোয়াল ঘরের মেঝেতে খড় বিছিয়ে গোমূত্র শোষণ করে নিয়ে সেই খড় কম্পোস্ট তৈরির কাজে ব্যবহার করলে কম্পোস্টে

নাইট্রোজেন খাদ্যউপাদানের উপস্থিতি বাড়ে। গোমূত্র সংগ্রহের চৌবাচ্চায় জলের সঙ্গে মিশে গোমূত্রের ইউরিয়া যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য প্রতিটি গরুর পিছু গোয়াল ঘরের মেঝে ও নিকাশি নালাতে প্রতিদিন ৫০০-১০০০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট ছড়িয়ে দিতে হবে।

কম্পোস্ট স্তূপের মধ্যে নাইট্রোজেন খাদ্যউপাদানটির ক্ষয় বা অপচয় বন্ধ করতে স্তূপে জল ছেটানো বেশি হওয়া চলবে না। স্তূপে প্রয়োজনের বেশি জল ছিটালে বা জল জমে গেলে গাছের খাদ্যউপাদানগুলির অপচয় হয়। স্তূপে জল জমা বন্ধ করতে, স্তূপের মাথায় ছাউনি দিতে হবে। তৈরি হওয়া কম্পোস্ট জমিতে প্রয়োগের পর সঙ্গে সঙ্গে ভালো করে চাষ দিয়ে জমির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।

ফসফো-কম্পোস্ট

অম্ল বা অম্লধর্মী মাটিতে ব্যবহারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য জৈবসার হল ফসফো-কম্পোস্ট। জীবাণু দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত আবর্জনা যখন জমিতে প্রয়োগের উপযোগী সারে রূপান্তরিত হয়, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাকে বলা হয় কম্পোস্ট সার। এই সার যখন ফসফরাস সমৃদ্ধ জৈববস্তু (খনিজ রক ফসফেট ও পাইরাইটের) সহযোগ তৈরি হয়, তখন তাকে বলে ফসফো কম্পোস্ট। অর্থাৎ, ফসফেট সমৃদ্ধ কম্পোস্ট সারকে ফসফো কম্পোস্ট বলে।

ফসফো কম্পোস্ট তৈরি করতে সারাদিন রোদ পায় এমন একটি জায়গা পছন্দ করতে হবে। বিভিন্ন জৈব বস্তুগুলি সমপরিমাণে ভালোভাবে মিশিয়ে ৫ হাত লম্বা, ৪ হাত চওড়া স্থানে আবর্জনার প্রথম স্তরে ১৫ কেজি জৈবপদার্থ রাখতে হবে। এরপর ছড়াতে হবে অন্যান্য জৈব ও অজৈব বস্তু। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় পরপর ঐ স্তূপের উপর ছড়াতে হবে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ১/২ লিটার জলে গুলে এবং ১০ কেজি কাঁচা গোবর ও ৫০ গ্রাম জীবাণু এক বালতি জলে গুলে।

আবার ৩ কেজি রক ফসফেট, ২ কেজি গোবর সার, ১ কেজি পাইরাইট সহ জমির মাটির উপর ১৫ কেজি মূল জৈববস্তুর আর একটি স্তর দিতে হবে এবং অন্যান্য উপকরণগুলি আগের মতো ছড়াতে হবে। এইভাবে পর পর স্তরে সমস্ত মূল জৈববস্তু ও অন্যান্য উপকরণ (মোট ৫০০ কেজি) স্তূপাকারে সাজানোর পরে স্তূপের উপরিভাগ ও চারদিকে দেওয়ালের গায়ে গোবর গোলা জলের প্রলেপ দিতে হবে। পরে পলিথিন শীট দিয়ে কয়েকটি ইটের সাহায্যে সমস্ত স্তূপটি ঢেকে দেওয়া দরকার, যাতে রোদে শুকিয়ে না যায় বা বৃষ্টির জল ঢুকতে না পারে।

৩-৪ সপ্তাহ পর স্তূপটি উল্টেপাল্টে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শুকিয়ে গেলে অল্প ছড়িয়ে আবার ঢেকে দিতে হবে। ২-৩ মাসের মধ্যে প্রায় ২৫০ কেজি (জমিতে প্রয়োগ করার উপযোগী) সার পাওয়া যাবে।

পত্র ঃ ১ অধ্যায় ঃ ১২ ● কেঁচো সার বা ভার্মিকম্পোস্ট

অধ্যায় সূচি

১২.১ গর্ত বা চৌবাচ্চা তৈরি
১২.২ ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির উপকরণ
১২.৩ প্রয়োজনীয় প্রজাতির কেঁচো সংগ্রহ
১২.৪ ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি
১২.৫ ভার্মিকম্পোস্টের গুণমান বৃদ্ধি
১২.৬ ভার্মিওয়াশ

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত বিবর্তনবাদের বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন মাটিতে ও চাষের কাজে কেঁচোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা প্রথম অনুধাবন করেছিলেন। কেঁচো হল কৃষি ও কৃষকের পরম বন্ধু। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিয়ে প্রচলিত চাষ পদ্ধতির কুফল থেকে মুক্তি পেতে জৈব চাষের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার বাড়ছে কেঁচো সার বা ভার্মিকম্পোস্টের।

ভার্মিকম্পোস্ট খুব ছোট আকারে নিজের জমির চাষের প্রয়োজনে অথবা মাঝারি থেকে নাতিবৃহৎ ব্যবসায়িক উদ্যোগের জন্য তৈরি করা যেতে পারে।

ভার্মিকম্পোস্টের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্যউপাদানের মাত্রা সাধারণ কম্পোস্টের চাইতে বেশি থাকায়, একই পরিমাণের সাধারণ কম্পোস্ট বা অন্য জৈব সারের চেয়ে ভার্মিকম্পোস্টে অধিকতর পরিমাণে বিভিন্ন খাদ্যোপদান পাওয়া যায়। এছাড়া, ভার্মিকম্পোস্টে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, অ্যান্টিবায়োটিক, হরমোন ও উপকারী জীবাণুর পরিমাণও বেশি থাকে। ভারত সরকারের ফার্টিলাইজার কন্ট্রোল অর্ডার অনুসারে ভার্মিকম্পোস্টের যেসব গুণাবলী থাকা দরকার তা নীচে দেওয়া হল।

ভার্মিকম্পোস্টের জন্য নির্ধারিত গুণমান

১।	আর্দ্রতা	ঃ	১৫-২৫%
২।	রঙ	ঃ	ঘন বাদামী থেকে কালো
৩।	গন্ধ	ঃ	দুর্গন্ধহীন
৪।	আকার	ঃ	শতকরা ৯০ ভাগ ৪ মিমি.
৫।	বাল্ক্ ডেনসিটি	ঃ	০.৭-০.৯ গ্রাম / সিসি
৬।	মোট জৈব অঙ্গার	ঃ	১৮.০% (কমপক্ষে)
৭।	মোট নাইট্রোজেন	ঃ	১.০% (কমপক্ষে)
৮।	মোট ফসফরাস	ঃ	০.৮% (কমপক্ষে)
৯।	মোট পটাশিয়াম	ঃ	০.৮% (কমপক্ষে)
১০।	ভারী ধাতুর পরিমাণ	ঃ	(সর্বাধিক, মিগ্রা / কেজি)
	ক্যাডমিয়াম	ঃ	৫.০
	ক্রোমিয়াম	ঃ	৫০.০
	নিকেল	ঃ	৫০.০
	সীসা	ঃ	১০০.০

১২.১ গর্ত বা চৌবাচ্চা তৈরি

চাষীদের নিজের চাষের প্রয়োজনে মোটামুটিভাবে ১০০ কেজি ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করতে প্রায় ১৫-১৬ কিউবিক ফুট জায়গার প্রয়োজন। অবশ্য আবর্জনার চরিত্র ভেদে এই আয়তনের কিছু হেরফের হতে পারে। কেঁচো সার তৈরির জন্য সাধারণভাবে ৩ ফুট চওড়া, ২.৫ ফুট উঁচু ও অন্ততপক্ষে ১০ ফুট লম্বা একটি ঘেরা জায়গা মাটির ওপর বানিয়ে নিতে হবে। এই চেম্বারের প্রস্থ ৩ ফুটের বেশি হলে অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যার অসুবিধা হবে। আবার, উচ্চতা খুব বেশি হয়ে গেলে পচনক্রিয়া ভাল হবে না। অবশ্য চেম্বারের দৈর্ঘ্য ১০ ফুটের বেশি হলে কোনও অসুবিধা নেই। চেম্বার বানাতে অসুবিধা হলে মাটির ওপর পলিথিনের চাদর পেতে তার ওপর আবর্জনা স্তূপ করে রাখলেও চলবে।

মাটির ওপরে কেঁচো সার তৈরি করতে হলে জল জমবে না এমন একটা উঁচু জায়গা নির্বাচন করা দরকার। স্থান নির্বাচন এমন ভাবে করতে হবে যেখানে প্রয়োজনমতো জৈব আবর্জনা সহজেই পাওয়া যায়। নির্বাচিত জায়গাটিতে ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে, বৃষ্টির জল বা রোদে কম্পোস্ট তৈরির কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেঁচো অন্ধকার পরিবেশ পছন্দ করে। তাই ছাউনি দেওয়া জায়গাটি যথাসম্ভব ছায়াচ্ছন্ন রাখতে পারলে ভাল হয়।

বাড়িতে কিচেন গার্ডেনের জন্য কেঁচো সার তৈরি করতে হলে একটি বড় মাপের প্লাস্টিকের বালতি বা ৫০ সেমি x ৫০ সেমি x ৬০ সেমি আকারের কাঠের প্যাকিং বাক্সও ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় বাগানে বা অল্প জমিতে ফসল চাষের জন্য ২ মিটার x ১ মিটার x ১ মিটার গর্ত খুঁড়ে বা ঐ মাপের চৌবাচ্চা তৈরি করে তার ভিতরেও কেঁচো সার তৈরি করা যাবে। এই আকারের গর্ত বা চৌবাচ্চার তলদেশে ভাঙা ইটের টুকরো/বালি বিছিয়ে তার ওপর ১৫-২০ সেমি গভীর ভাল দোঁআশ মাটির স্তর দিতে হবে। এরকম একটি গর্ত বা চৌবাচ্চায় প্রতি মাসে তৈরি হবে অন্তত ১ টন করে কেঁচো সার।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির জন্য একাধিক চেম্বারের প্রয়োজন। বছরে ১০ মেট্রিক টন কেঁচো সার তৈরি করতে হলে ২.৫ ফুট উঁচু, ৩ ফুট প্রস্থ এবং ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের ১৪টি চেম্বারের প্রয়োজন হবে। ১৪টি চেম্বার থেকে প্রতিবারে ১৪ মেট্রিক টনের মতো এই কম্পোস্ট পাওয়া যাবে। বছরে প্রতিটি চেম্বারে ৭-৮ বার ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি হবে।

১২.২ ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির উপকরণ

ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করতে উপকরণ হিসাবে লাগে গোবর, নানা ধরনের জৈব পদার্থ, বর্জ্য পদার্থ, গৃহস্থ ঘরের আবর্জনা, শুকনো পাতা, খড়ের স্তর এবং কেঁচো ও কেঁচোর ডিম। এছাড়া ভেজা চট, ছাউনি দেবার জন্য প্লাষ্টিকের চাদর, কাঠের ছাই, বালি প্রভৃতিও লাগবে।

১২.৩ প্রয়োজনীয় প্রজাতির কেঁচো সংগ্রহ

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩০০০-এর বেশি জাতের কেঁচো পাওয়া যায়। এর মধ্যে ভারতে পাওয়া যায় প্রায় ৫০৯টি জাতের কেঁচো। কেঁচো মাটিতে বসবাসকারী অমেরুদন্ডী প্রাণী। এদের শরীরে বিশেষ কোনো প্রত্যঙ্গ না থাকলেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হুক জাতীয় অবয়ব 'সিটি' আছে। এগুলির সাহায্যে এরা মাটি আঁকড়ে থাকে এবং মাটির মধ্যে চলাচল করে।

সমস্ত জাতের কেঁচোকে ১০টি গোত্রে ৬৭টি গণের মধ্যে বিভক্ত করা যায়। এদের বেশির ভাগই অবশ্য স্থানীয়, যা ৪৭টি গণের অন্তর্ভুক্ত। সব জাতের কেঁচোই 'ভার্মিকম্পোস্ট' বা কেঁচো সার তৈরিতে সাহায্য করে। কিছু কেঁচো মাটির গভীরে বাস করে এবং মাটির সঙ্গে মিশ্রিত জৈব পদার্থ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। আবার, কিছু প্রজাতির কেঁচো মাটির ঠিক নীচের স্তরে বসবাস করে। এছাড়া যেসব কেঁচো মাটির ওপরে থাকে, তারা সেখানকার বিভিন্ন জৈব পদার্থকে নিজেদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এদের এপিজেয়িক শ্রেণীর কেঁচো বলে। ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য এই শ্রেণীর কেঁচোগুলিই বেশি ব্যবহার করা হয়।

যেসব কেঁচো মাটির ওপর দিকে অবস্থান করে, তারা এই রাজ্যে জল-হাওয়ার বিশেষ উপযুক্ত। এরা বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ থেকে সার তৈরিতে বেশ দক্ষ। এইসব কেঁচো প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এই বিশাল পরিমাণের জৈব পদার্থের মাত্র ৫-১০ শতাংশ কেঁচো তাদের শরীর গঠনের জন্য ব্যবহার করে। বাকি ৯০-৯৫ শতাংশ বর্জ্য পদার্থ হিসাবে শরীর থেকে বের করে দেয়। এই খাদ্যগ্রহণ ও বর্জনের মাঝখানে কয়েকটি স্তর থেকে যায়, যা এই বর্জিত জৈব পদার্থের দ্রুত পচনে সাহায্য করে। কেঁচোর খাদ্যনালীতে প্রচুর পরিমাণে নানান ধরনের জীবাণু ও উৎসেচক থাকে। পচন প্রক্রিয়ার সময় তারা খাদ্যকণাগুলির সঙ্গে ভালোভাবে মিশে যায়। ফলে এইসব জৈব পদার্থ যখন কেঁচোর শরীর থেকে বর্জিত হয়, তখন এই জীবাণু ও উৎসেচকগুলি জৈব পদার্থের পচনক্রিয়াকে দ্রুতহারে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, এইসব বর্জিত জৈব পদার্থ মোটামুটি এক মাসের মধ্যেই কেঁচো সারে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সাধারণ কম্পোস্টের থেকে এই কেঁচোসারে খাদ্যউপাদানের পরিমাণও বেশি থাকে।

সহজলভ্য খাদ্যোপাদনের পরিমাণ ঃ দু'ধরনের কম্পোস্ট

জৈব আবর্জনা	কম্পোস্টে সহজলভ্য খাদ্যোপাদানের পরিমাণ (পিপিএম)					
	নাইট্রোজেন		ফসফরাস		পটাশিয়াম	
	ভার্মি কম্পোস্ট	সাধারণ কম্পোস্ট	ভার্মি কম্পোস্ট	সাধারণ কম্পোস্ট	ভার্মি কম্পোস্ট	সাধারণ কম্পোস্ট
রান্নাঘরের আবর্জনা	৪০৬০.০	৩৪৩০.০	৯০৮.৩	৪৮৪.৫	৬৩৫০.৫	৫১০০.০
গোবর	৩৭৮০.০	১৬৮০.০	১১৮৬.৫	৬২৬.৯	৭০৮০.০	৫৪০০.০
পোল্ট্রির আবর্জনা	৩৪৩০.০	২৫২০.০	১২৪৮.৬	১১৩১.১	৪১৫০.০	৩৭০০.০
পৌর আবর্জনা	৩০১০.০	২১৩৫.০	১০০৫.০	৪১৩.৪	২৯৫০.০	২৮০০.০
বিভিন্ন গাছের পাতা	৪২০০.০	৩২৯০.০	৫০১.০	১৫১.৯	২১৫০.০	১২০০.০

সব ধরনের মাটিতেই কেঁচো থাকে, যদি সেই মাটিতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ ও জল থাকে। জঙ্গল, ঘাসজমি, শস্যখেত, চাষোপযোগী জমি, বাগান, বীজতলা তৈরির জমি এবং এমনকী গ্রীনহাউসেও কেঁচো দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন বাগিচা ফসলের জমিতে, বাঁশঝাড়ে, কলা বাগানে পাম গাছের গোড়ায়, খড়ের গাদার নীচের মাটিতে, এমনকী পাতার গোড়াতেও কেঁচো দেখা যায়। তবে বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ জমি হল কেঁচোর আদর্শ বাসস্থান।

ভার্মিকম্পোস্টিং-এ ব্যবহৃত কিছু কেঁচোর তালিকা

(১) ল্যাম্পিটো মরিটি

(২) এক্টাকিটোনা সিরেটা

(৩) পেরিওনিক্স এক্সক্যাভাটাস

(৪) আইসেনিয়া ফেটিডা

(৫) ইউড্রিলাস ইউজিনি

এই কেঁচোগুলি সাধারণভাবে তাদের দেহের ওজনের ২-৫ গুণ খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করতে পারে। এই খাদ্যের মাত্র ৫-১০ শতাংশ তাদের দেহের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং বাকিটা তারা মল আকারে বর্জন করে দেয়। কেঁচোর অন্ত্রনালীতে অনুকূল পরিবেশের কারণে নানান জীবাণু উৎসেচক ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত থাকে। এগুলি গৃহীত খাদ্যের সঙ্গে মিশে যায়। এরপর কেঁচো যখন মলত্যাগ করে, তখন এই সব জীবাণু উৎসেচক কেঁচোর মলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সবাত পচনক্রিয়ার মাধ্যমে এই অর্ধপাচ্য জৈব পদার্থকে উচ্চমানের ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সারে পরিণত করে।

ওপরে উল্লিখিত কেঁচোগুলি অথবা আরো কিছু ধরনের কেঁচো এককভাবে বা মিলিতভাবে ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কোন ধরনের কেঁচো ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য ব্যবহার করা হবে তা নীচে দেওয়া কয়েকটি ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে ঃ

(ক) অধিকমাত্রায় খাদ্যগ্রহণ ক্ষমতা;

(খ) পরিবেশের তারতম্যের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা;

(গ) দ্রুত বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা;

(ঘ) তাড়াতাড়ি বড় হওয়া, এবং

(ঙ) চেম্বারে কেঁচো ছাড়ার পরে দ্রুত স্বাভাবিকভাবে কাজ করার ক্ষমতা।

বিভিন্ন প্রজাতির কেঁচো নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে আইসেনিয়া ফেটিডা জাতীয় কেঁচোর কার্যক্ষমতা সব চাইতে বেশি। এছাড়া ইউড্রিলাস ইউজিনি, পেরিওনিক্স এক্সক্যাভাটাস ও ল্যাম্পিটো মরিটিও যথেষ্ট কার্যক্ষম। তবে ভার্মিকম্পোস্টিং যেখানে করা হবে সেই অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে এইসব কেঁচোদের কার্যক্ষমতার কিছু হেরফের হতে পারে।

১২.৪ ভার্মিকম্পোস্ট তৈরির পদ্ধতি

কেঁচোসার বা 'ভার্মিকম্পোস্ট' খুব সহজেই তৈরি করা যায়। নানা ধরনের জৈব পদার্থ, বর্জ্য পদার্থ — যা ফেলে দেওয়া হয় বা পচে গেলে পরিবেশে দূষণ করে, অনায়াসে সেগুলিকে উন্নতমানের কেঁচোসার বানানোর কাজে ব্যবহার করা যায়।

কেঁচো সার তৈরি করতে প্রথমে গর্ত বা চৌবাচ্চা বানিয়ে নিন। এরপর সংগৃহীত আবর্জনার সঙ্গে শতকরা হিসেবে অন্তত ২০-২৫ ভাগ গোবর মিশিয়ে ১০-১২ দিন একটু ভিজে অবস্থায় রাখতে হবে। এই সময় প্রাথমিক পচনের কারণে এই মিশ্রণের তাপমাত্রা অনেকখানি বেড়ে যায়, তারপর ধীরে ধীরে কমে যায়। তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এলে প্রতি কুইন্টাল মিশ্রণে ১৫০০-২০০০ কেঁচো ছাড়তে হবে এবং মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে মিশ্রণে ৪০-৫০ শতাংশ আর্দ্রতা রাখতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে, মিশ্রণে জলের ভাগ যেন খুব বেশি হয়ে না যায়। হলে, সেখানে অক্সিজেনের অভাব ঘটতে পারে ও কম্পোস্টিং ব্যাহত হতে পারে। আট দশ দিন অন্তর সমগ্র মিশ্রণটি উল্টেপাল্টে দিলে কম্পোস্টিং দ্রুততর হবে। সাধারণত ২৫-৩৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভার্মিকম্পোস্টিং সব চাইতে ভাল হয়। মিশ্রণের তাপমান এর চাইতে খুব বেশি বা কম হলে পচনক্রিয়ার গতি ব্যাহত হতে পারে। এজন্য শীতকালে ভার্মিকম্পোস্টিং হতে কিছুটা বেশি সময় লাগে। এছাড়া ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য ব্যবহৃত আবর্জনা মিশ্রণের পিএইচ মান মোটামুটি নিরপেক্ষ থাকা উচিত। না হলে কেঁচো এবং পচনক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী জীবাণুদের অসুবিধা হতে পারে। তবে ভার্মিকম্পোস্টিং-এর জন্য সাধারণত যে সমস্ত আবর্জনা ব্যবহার করা হয় তাতে পিএইচ আম্লিক হওয়ার সম্ভাবনা কম।

কেঁচোর সংখ্যা তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং সর্বোপরি আবর্জনার গুণমান ঠিক থাকলে মোটামুটি ৩০-৪০ দিনের মধ্যেই ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত। এই সময় জৈব আবর্জনাগুলিকে সার থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। মিশ্রণের রঙ কালচে থেকে বাদামীর মধ্যে থাকে। এদের মধ্যে কোনও আঠালো ভাব থাকে না বা এদের থেকে কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় জল দেওয়া কিছুদিন বন্ধ রাখলেই সমগ্র মিশ্রণটি প্রায় ঝুরঝুরে হয়ে যাবে। এবার এই মিশ্রণটিকে চালুনির সাহায্যে ছেঁকে নিলে ভার্মিকম্পোস্ট চালুনি গলে নীচে চলে যাবে এবং কেঁচোগুলি কিছু অর্ধপচিত আবর্জনার সঙ্গে ওপরে থেকে যাবে। এই একমাসের ব্যবধানে কেঁচোর সংখ্যাও অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। এইসব কেঁচোগুলিকে আবার নতুন আবর্জনার মিশ্রণে ছেড়ে দিয়ে আরও বড় আকারে ভার্মিকম্পোস্টিং করা যেতে পারে। যেখানে বৃহৎ আকারে ভার্মিকম্পোস্টিং করা হয় যেখানে অনেক সময় কম্পোস্ট তৈরি হয়ে গেলে ওপর থেকে তীব্র আলো ফেলা হয়। যেহেতু কেঁচোর বেশি আলোতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেজন্য এভাবে আলো পড়লে কেঁচোগুলি চেম্বারের ভেতরে ঢুকে যায় এবং তখন ওপর থেকে ভার্মিকম্পোস্ট সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। তবে এই সব ক্ষেত্রে ভার্মিকম্পোস্টের সঙ্গে কম্পোস্ট না হওয়া কিছু জৈব পদার্থও চলে আসতে পারে, যার ফলে কম্পোস্টের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

আর একভাবেও ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করা যায়। এই পদ্ধতিতে গর্ত বা চৌবাচ্চা তৈরি করে তার তলায় ভাঙা ইটের টুকরো বা বালি বিছিয়ে দিতে হবে। এর ওপর ছড়াতে হবে ১৫-২০ সেমি পুরু করে ভাল দোঁআশ মাটির স্তর। এবার শ'খানেক কেঁচো অথবা কেঁচোর ডিমসহ ভার্মিকম্পোস্ট দিতে হবে মাটির স্তরের ওপর। তার ওপর বিছাতে হবে গোবর এবং গোবরের ওপর শুকনো পাতা বা খড়ের স্তর। মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে সমানভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে সব স্তরগুলিকে। জল বেশি দেওয়া চলবে না কখনো। ৪ সপ্তাহ পর গাছের সবুজ পাতা, সদ্য কাটা নরম ডালপালা, আনাজের খোসা প্রভৃতি ৫ সেমি পুরু করে ওপর থেকে বিছিয়ে দিতে হবে গর্ত না ভরা পর্যন্ত। ৩-৪ দিন অন্তর এবার একই ভাবে খোসা, পাতা প্রভৃতি দিয়ে মাঝে মাঝে হালকা করে ওলট-পালট করে দিতে হবে। কেঁচোর ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতে পারা যায় ভার্মিকম্পোস্ট ঠিকমতো তৈরি হচ্ছে কী না। চৌবাচ্চার ওপর একটা চালা তৈরি করতে হবে, যাতে কড়া রোদের তাপ বা বৃষ্টিতে ক্ষতি না হয়। জৈব পদার্থের রং যখন কালচে হয়ে আসবে তখন জল দেওয়া চলবে না। সার তৈরি হয়ে গেলে কেঁচোরা গর্তের নীচে চলে যাবে। তখন ঝুরঝুরে দানার জৈব সার বার করে নিয়ে শুকিয়ে চেলে বস্তায় বা প্যাকেটে ভরা যাবে। সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা যাবে তৈরি হওয়া এই সার।

ফসলের জমিতে সরাসরি কেঁচোসার তৈরি করতে হলে হেক্টর প্রতি ৫ টন মাপে ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচোর ডিমসহ ঐ সার প্রয়োগ করুন। তার ওপর ২.৫ সেমি গোবর বা প্রেসমাডের আস্তরণ (চিনি তৈরির আগে আখের রসের বর্জ্য পদার্থ) দিন। এর ওপরে থাকবে ১০ সেমি পুরু আখের ছিবড়ে, শস্যের খোসা বা অবশিষ্টাংশ বা শহরতলির আবর্জনা। একমাসের মধ্যে ডিম ফুটে কেঁচোরা বেরিয়ে জৈব পদার্থকে সারে পরিণত করতে শুরু করবে। এভাবে ১০০০ টন ভেজা জৈব পদার্থকে ৩০০ টন সারে পরিণত করবে এই কেঁচোর দল। এজন্য ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে।

সাবধানতা

(১) ভার্মিকম্পোস্ট পিটের ওপরে একটা ভেজা চটের ঢাকনা দিতে হবে।

(২) লাল পিঁপড়ে ঠেকাতে লঙ্কা ও হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে নুন ও সামান্য সাবান গুঁড়ো জলের সাথে মিশিয়ে কম্পোস্ট গর্তের চর্তুদিকে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

(৩) ইঁদুর, ছুঁচো প্রভৃতি ঠেকাতে তারের জলের ঢাকনা গর্তের উপর লাগিয়ে দিতে হবে।

১২.৫ ভার্মিকম্পোস্টের গুণমান বৃদ্ধি

গোবর সার এবং কেঁচোসারের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় কার্বন ও ফসফরাস কেঁচো সারে বেশি থাকে। নাইট্রোজেন থাকে প্রায় সমান সমান। কেঁচো সারের সঙ্গে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও প্রয়োজনীয় অনুখাদ্য নির্ধারিত মাত্রায় মিশিয়ে নিলে ফসল প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানগুলি কেঁচোসার থেকে সহজেই পাবে।

ভার্মিকম্পোস্টের গুণমান বৃদ্ধির জন্য আবর্জনার থেকে পেঁয়াজের খোসা ও শুকনো গাছের পাতা বাদ দিতে হবে। এগুলি সহজে পচে না। হাঁস মুরগির খামারের বর্জ্যও নেওয়া চলবে না। কারণ,

এগুলি পচলে কম্পোস্ট পিটে তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কেঁচো বেশি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। টক ফল, মাছ মাংসের উচ্ছিষ্ট প্রভৃতি আবর্জনা থেকে বাদ দেওয়া দরকার। কারণ, এগুলি পচলে ভার্মিকম্পোস্ট পিটে অম্লত্ব সৃষ্টি হবে যা কেঁচো সহ্য করতে পারে না। সামান্য ক্ষারত্ব কেঁচোর খুব পছন্দের। জৈব বর্জ্যগুলি কেটে ছোটছোট টুকরো করে কেটে গর্ত বা চৌবাচ্চায় ঢালতে হবে যাতে তাড়াতাড়ি পচে। টুকরোগুলির সঙ্গে বেলে বা দোঁআশ মাটি মিশিয়ে নিতে হবে। এটেল মাটি নয়।

১২.৬ ভার্মিওয়াশ

ভার্মিওয়াশ হল কেঁচো ধোয়া জল, যার মধ্যে কেঁচোর দেহ থেকে বের হওয়া রস বা নির্যাস মিশে থাকে। এর মধ্যে কেঁচোর দেহ বর্জিত পদার্থও থাকে।

ভার্মি ওয়াশ হালকা হলুদ রঙের স্বচ্ছ তরল পদার্থ।

ভার্মিওয়াশের ব্যবহার

(১) তরল জৈবসার হিসেবে ভার্মিওয়াশ ব্যবহার করা হয়।

(২) এই তরল জৈবসার প্রধানত গাছের পাতায় স্প্রে করা হয়।

(৩) চারাবাড়ির চারা গাছ, লনের ঘাস এবং অর্কিড-এর এটি একটি উৎকৃষ্ট ভালো খাবার।

(৪) ফুলদানির জলে এই তরল দেওয়া হয় এবং এর ফলে ফুলদানির ফুল বহুদিন তাজা থাকে।

(৫) জীবাণুনাশক, ছত্রাকনাশক হিসেবে এটি ভালো কাজ করে।

গাছের শিকড়ের কাছে বা গোড়ার কাছে এই ভার্মিওয়াশ প্রয়োগ করা হয়। গাছ প্রতি প্রায় ১০০ মিলিলিটার এই তরল পদার্থ দেওয়া হয়। গাছের পাতায় স্প্রে করা হলে এই ১০০ মিলিলিটার ভার্মিওয়াশের সাথে জল মিশিয়ে লঘু করা হয় (প্রায় ৩০০ মিলিলিটার জল মিশিয়ে তরলের পরিমাণ ৪০০ মিলি করা হয়।)

ভার্মিওয়াশে মূল উদ্ভিদ খাদ্যউপাদান নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশ ছাড়াও সালফার (গন্ধক) , সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্লোরাইড, আয়রণ ও সামান্য পরিমাণে অ্যামোনিয়া থাকে। এছাড়া এতে কিছু জীবাণুনাশক পদার্থ ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক পদার্থ মিশে থাকে।

একটি পাত্রে রাখা এক লিটার হালকা গরম জলে (৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার মতো) এক কেজি কেঁচো ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ৩-৪ মিনিট পর কেঁচোগুলি তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে স্বাভাবিক উষ্ণতায় (২৫°-২৭° সেঃ) রাখা জল ভরা পাত্রে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর দুটি পাত্রের জল একত্রে মিশিয়ে ভার্মি ওয়াশ প্রস্তুত করা হয়। এরপর নীচে কল লাগানো একটি প্লাস্টিক বা কাঁচের পাত্র নিয়ে বালির স্তর এবং পাথর বা ইটের টুকরোর মধ্যে পাতলা পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে ওপর থেকে আস্তে আস্তে আগে বানানো তরল ভার্মিওয়াশ ঢেলে কল খুলে তলা থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে।